এখন ডুয়ার্স

১৬-৩১ জানুয়ারি ২০১৭। ১২ টাকা

ক্যাশলেস ডুয়ার্সে বিপর্যস্ত কৃষক!

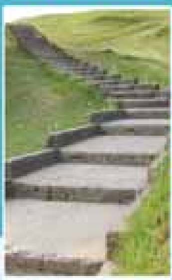

কামতাপুরের খনন ত্বরান্বিত হোক

নোট বাতিলের ছায়া পড়ল কি ডুয়ার্সের মেলা-উৎসবে?

মেঘ ছুঁয়ে যায় মন্ডলগাঁও

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

HOLIDAYAAR

SILIGURI • COOCHBEHAR • JALPAIGURI

Package Tour from NJP to NJP 2017-18

FIXED DEPARTURE IN GROUPS

Shimla, Kulu, Manali (12 Days)
Shimla, Manali, Rotangpass, Kullu, Kuffri, Chandigarh
Date of Journey: 28/05/17

Rs. 16,500 (Per head)
Rs. 14,500 (3rd person)
Rs. 10,000 (5-11Yrs Child)
Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)

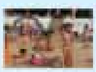

Mumbai-Goa (16 Days)
Mumbai, Goa, Mahabaleswar, Aurangabad, Ajanta, Ellora
Date of Journey: 29/09/17

Rs. 22,000 (Per head)
Rs. 19,500 (3rd person)
Rs. 15,500 (5-11Yrs Child)
Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)

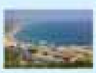

Kerala with Kanyakumari (15 Days)
Kochin, Munnar, Thekkedy, Allepy, Trivandrum, Kanayakumari
Date of Journey: 06/10/17

Rs. 20,600 (Per head)
Rs. 18,500 (3rd person)
Rs. 15,000 (5-11Yrs Child)
Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)

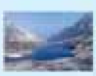

Arunachal (12 Days)
Guwahati, Dirang, Bhalukpong, Tawang, Selapass, Bomdila
Date of Journey: 16/04/17

Rs. 22,600 (Per head)
Rs. 20,500 (3rd person)
Rs. 16,000 (5-11Yrs Child)
Rs. 8,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)

Rajasthan with AC Bus (16 Days)
Jaipur, Ajmer, Puskar, Chittorgarh, Udaipur, Mount Abu, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner
Date of Journey: 04/01/18

Rs. 21,500 (Per head)
Rs. 19,000 (3rd person)
Rs. 15,000 (5-11Yrs Child)
Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)

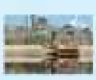

Dooars (4 Days)
Garumara, Murti, Jhalong, Bindu, Jaldapara, Chilapata
Date of Journey: 21/01/17, 20/05/2017, 20/12/2017

Rs. 8,200 (Per head)
Rs. 7,100 (3rd person)
Rs. 4,400 (5-11Yrs Child)
Rs. 2,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)

LTC/LFC

Tailor made Packages. Any Time.

ANDAMANS

Ex Port Blair. 6N 7D

Portblair Sightseeing, Cellular Jail, North Bay-Ross Island/Jolly Buoy, Havelock/Neil island, Jarwa Reserve. Rs 16,500 Standard. CP, Non AC Vehicle & Govt Boat. Additional charges for Mayabandar-Diglipur.

GOA

Ex Dabolim Airport / Madgaon Rly. Stn. 3N 4D. Rs. 13,900 Standard. Plan CP, Pick up & drop Station/Airport, tea coffee maker, one full day sightseeing trip with river Mandovi cruise, Unlimited Swimming Pool. (Except Dec. 15 to Jan. 5)

KERALA

Ex Cochin. 7N 8D
Cochin-Munnar-Thekkady-Alleppey/Kumarakom-Kovalam
Rs 26,000 for Deluxe.
Plan CP; AC vehicle for transfer & sightseeing.

LAKSHADWEEP

Ex Cochin. 5N 6D. Cochin 1N - Kavaratti, Kalpeni, Minicoy 4N on Cruise Rs 29,500. Plan CP. Pick up and drop from Cochin Airport / Rly. Stn.

BANGKOK PATTAYA

5N 6D. Pattaya 3 Nights & Bangkok 2 nights.
Rs 35,000 onward (Except December & January).

SIKKIM-NORTH BENGAL

Ex Bagdogra / NJP. 4N 5D
Darjeeling/Kalimpong, Gangtok/ Pelling. Rs 8,900 onward. Plan CP; NonAC vehicle for transfer & sightseeing.

All rates are per head and on twin/triple sharing basis, minimum 4 adults required.

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Cooch-Behar Office: Sitalabari Road, Ward No. 5, Dinhata 736135, Ph: +91 9434042969
Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-লুডো-ক্যারাম। পার্টি। গেট টুগেদার। সেমিনার।

বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা

শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

তৃতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (অন্তবর্তী সংস্করণ) ১৬-৩১ জানুয়ারি ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ক্যাশলেস ডুয়ার্সে বিপর্যস্ত কৃষক? ৪

কামতাপুরের হদিশ বহু বাকি খননকার্য আরও দ্রুত হোক ৮

খালি চোখে

বাম আমল থেকেই কলেজ প্রাঙ্গনে দুর্বৃত্তায়ন অধুনা তোলাবাজি ১৪

নোট বাতিলের ছায়া আদৌ পড়ল কি ডুয়ার্সের মেলা-উৎসবে? ১৭

বাগিচা শ্রম আইন চুলোয়, সরকার কি এখনও জেগেই ঘুমাবে? ১৯

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স ৩৩

ডুয়ার্সের ডায়েরি

ডুয়ার্সের শীত, শীতের ডুয়ার্স ৩৫

পর্যটনের ডুয়ার্স

জানালা দিয়ে হাত বাড়াও মেঘ ছুঁয়ে যাবে ২২

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ২৬

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৫

বইপত্রের ডুয়ার্স ৩৭

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৮

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৪

তরাই উৎরাই ২৮

লাল চন্দন নীল ছবি ৩০

শ্রীমতী ডুয়ার্স

এবারের শ্রীমতী ৪২

ডুয়ার্সের ডিশ ৪৩

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ক্যাশলেস ডুয়ার্সে বিপর্যস্ত কৃষক?

কোনও কৃষিজীবী বা কৃষিবিজ্ঞানীর কাছে যাওয়ার আগে কিংবা কোনও শহুরে তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ শোনার চেয়ে এ প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর সহজেই মিলবে ব্যাংকের গ্রামীণ শাখাগুলি থেকে। 'কালাধন' উদ্ধার অভিযানে প্রধানমন্ত্রীর রিসোর্স সেন্টার ছিল দেশজুড়ে ব্যাংকের এই গ্রামীণ নেটওয়ার্ক। ভ্রষ্টাচার রোধ করতে দেশের তস্করকুলকে বিন্দুমাত্র 'ক্লু' দেননি ঠিকই, কিন্তু ক্যাশলেস সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'নয়া যুগ কা স্বামীজী' হওয়ার নেশায় সম্ভবত তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, সময়টা কৃষিনির্ভর এই দেশে বড়ই বেআক্কেলে, ফলে দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতোই ডুয়ার্সের চাষিদেরও ভোগান্তি এবং ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। রবি শস্যের মরশুম সূচনায় হাজার ঝুঁকি নিয়ে ডুয়ার্সের চাষিও ঋণের পথে পা বাড়ায় মূলত আলুচাষে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি বলেই। ব্যাংক ঋণের জটিলতায় বা রাজনীতি আশ্রিত দালাল চক্রের ঝামেলা থেকে বাঁচতে অনেকেই পা দেয় মহাজনের ঋণের ফাঁদে। 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা' কৃষকের এই ঝুঁকি আদৌ কতটা কমাতে পেরেছে বা সেখানেও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটবে কিনা তা পরখ করার সুযোগই মিলল না। তার আগেই ঘোষিত হল নোট বাতিল ফতোয়া।

এতে ধনী কৃষকের ঘরে জমিয়ে রাখা বহু টাকা সরকারি কোষাগারে ঢুকল ঠিকই, কিন্তু এই মোক্ষম সময়ে আসলে ঝাড় খেল দরিদ্র চাষি। যে সময় দৈনিক মজুরি, গোবর, সার, বীজ কেনার জন্য প্রয়োজন নগদ টাকার, বিমুদ্রাকরণের ধাক্কায় সে সময় নোটের আকাল সরাসরি প্রভাব ফেলল কৃষিতে, এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। নোটের অভাবে বা শোকে ব্যাপারীরা ধার দিতেও বেঁকে বসল। চারদিকে বইতে থাকা অনিশ্চয়তার হাওয়ায় মুষড়ে পড়ল ছোট ছোট কৃষক। একদিকে পুরনো নোট জমা পড়ার চাপে বিধ্বস্ত ব্যাংককর্মীরা সুযোগই পেলেন না কৃষি ঋণের পরিমাণ বাড়াবার, তার উপর যোগ হল নোটের অভাবে পুরনো ঋণের অনাদায়ের পরিমাণও। যে চাষি বিঘা প্রতি ঋণ পেত কুড়ি হাজারেরও বেশি, নোটের যোগান কম থাকায় সেই দরিদ্র চাষি এবার স্বভাবতই চাষের জমির পরিমাণ অনেকটাই কমাতে বাধ্য হল। কৃষককুলের অনুমান, গতবারের তুলনায় এবার ডুয়ার্সে আলুচাষ হচ্ছে মাত্র এক-চতুর্থাংশ জমিতে। মুষ্টিমেয় বড়লোক চাষি বিমুদ্রাকরণের ধাক্কা সামলে নিয়েছেন, কিন্তু এর ফলে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন দরিদ্র চাষি এবং তার সঙ্গে দিনমজুররা।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় চাষিদের সহযোগিতার জন্য সরকারি স্কিম চালু হলেও রাজ্যে বিমুদ্রাকরণের তীব্র বিরোধিতায় সেইসবের বাস্তবায়ন ঘটেনি। ফলে দরিদ্র কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ কমেনি। নোট বাতিলেই ইতিমধ্যেই সবজি চাষে আশানুরূপ দামের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি ছোট ছোট চাষিরা, আলুর ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি হলে দুর্দশার পরিমাণ আরও বাড়বে সন্দেহ নেই। অথচ জোগান কম হলে ফড়েদের দৌরাত্ম্যে ভুগবে সাধারণ ক্রেতারা। বছরের এই সময়টার জন্যই অপেক্ষায় থাকেন যে কৃষক দুটো বেশি রোজগারের আশায়, এবারের শীত তাদের জন্য যে খুব একটা ভাল বার্তা বয়ে আনছে না তা একপ্রকার নিশ্চিত।

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

চিন্তালাইন

আমবাড়ির চিন্তামোহন স্কুলের সামনে ইট পেতে রাত জেগে ধুন্ধুমার লাইন দিচ্ছিল লোকজন। কেন? কেন? সেখানে কি কোনও অলৌকিক এটিএম থেকে ইচ্ছেমতো নোট মিলছিল নাকি? ও আচ্ছা! লাইনদাতারা সবাই অভিভাবক! স্কুলে ভরতির ফর্ম তোলার জন্য শীতের রাতে না ঘুমিয়ে কাঁপতে কাঁপতে লাইনমে খাড়া হচ্ছিলেন! কিন্তু কেন বাপু? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ভয়ের কথাই বটে! স্কুলে ভরতি নেবে বড়জোর আড়াইশো। দিনপ্রতি আশিটার বেশি ফর্ম ছাড়বে নাকো স্কুল কমিটি। তা হলই বা তা! এর জন্য খামকা রাত জাগা কেন? দেশে কি আর স্কুল নেইকো? শুনে

অভিভাবকরা বলছেন যে, পরের স্কুলটা বেশ দূরে। মানে চিন্তামোহন ছাড়া ১০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনও স্কুল নেইকো! তাই চিন্তায় ঠাঁই না হলে মহাচিন্তার বিষয় হয়ে যাবে। এই জন্যই রাত জেগে চিন্তালাইন। শিক্ষাপ্রেমীরা সব শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছেন, ডুয়ার্সে নিত্যনতুন কলেজ হচ্ছে ভাল কথা। কিন্তু নতুন স্কুল হচ্ছে না কেন?

মৃতজনে দেহ প্রাণ

বাপ রে! রায়গঞ্জের রবীন্দ্রনগরে ডজনখানেক মৃত ব্যক্তি রোজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাজার করছে, এটিএম-এর লাইনেও দাঁড়াচ্ছে গো! তারা জানে যে তারা জীবিত। কিন্তু অলপ্পেয়ে ভোটার লিস্টির কাণ্ড দেখো! বিলকুল তাদের বেহেস্তে পাঠিয়ে দিয়েছে! জানার পর জ্যান্ত মানুষগুলো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে ছুটে ছুটে আসছে কমিশনের আপিসে! সকলকেই কাজকম্ম করে খেতে হয়। কাজের মালিক যদি জানে তার কর্মী বেঁচে নেই, তবে কী হবে ভেবেছ একবার? কাণ্ড দেখে সব ক'টা রাজনৈতিক দল রেগে লাল। নো বিরোধিতা! এতেই 'মৃতজনেরা' দেহে প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশায় দিন গুনে চলেছে। সবাই যখন রেগেছে, তখন একটা হেস্তনেস্ত হবেই হবে!

এগেইন করলা

টাউনের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া করলাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নয়নাভিরাম করে তোলার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কোমর বেঁধে লেগেছিল বটে। কাজও শুরু হয়ে এগিয়েছিল খানিকটা। ঘোর সংশয়বাদী পাবলিকও স্বীকার করছিল যে, হুঁ। কাজটা মন্দ হচ্ছে নাকো! কিন্তু তারপরেই জেলার সেচ বিভাগের কর্তারা দুম করে পত্রবোমা দেগে জানিয়ে দিল যে, করলা হল নদী। সকল নদীই সেচ বিভাগের অধীন। তুমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কোথাকার কে হে? ব্যাস! সরকারি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কাজ বন্ধ। বেচারা করলার মুখ ভার। না সাজি তা-ও ভাল, কিন্তু অর্ধেক সেজে মুখ দেখাব কী করে? তা এমনই চলছিল দেখে সে দিন করলার পাড়ে হাজির হয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রবিবাবু মিনিটখানেক এদিক-ওদিক দেখে সেচ বিভাগের কর্তাদের তক্ষুনি তলব করলেন। তাঁরা হাজির হতেই মন্ত্রী চোখা গলায় জানতে চাইলেন যে, কী সমস্যা সেচবাবুদের। বাবুরা চুপ। রবিবাবু অমনি হুকুম দিলেন, তুচ্ছ কারণে গোষ্ঠীবাজি করতে নেই। সেচবাবুরা সঙ্গে সঙ্গে সোনামুখ করে অভিযোগ ফিরিয়ে নিলেন। ব্যাস! সমস্যা শেষ। কাজ শুরু হল বলে। এবার দেখবে করলা কেমন সাজে!

কলেজের লেজ

ডুয়ার্স জুড়ে কলেজ নির্বাচনের হাওয়া জব্বর জমে গিয়েছে তৃণভাইদের সেমসাইড হাতাহাতির কারণে। রামদাদার ভাই শ্যামদাদার ভাইকে ঠেঙাচ্ছে, গতিদাদার

বোন অতিদাদার বোনকে ল্যাং মারছে— সব মিলিয়ে অবস্থা এমন ঘোরালো যে, বিরোধীরা কোনও খবরেই থাকছে না। পুলিশের অবস্থা ভারী খারাপ। এই ভাইকে ধরলে ওই দাদা খিস্তাচ্ছে, এই বোনকে ধমক দিলে ওই বোন এসে হাতে অপমানসূচক রাখি পরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তা এই চক্করে কে বা কারা জানি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর নাম জড়িয়ে কুকথা কইছে। মন্ত্রী রবিবাবুর খাস মহাল কোচবিহারে নাকি তাঁর ভাইদের বেজায় বাড়বাড়ন্ত। তাঁদের ইচ্ছেতেই নাকি নির্ধারিত হচ্ছে কে কোথায় জিএস হবে। অবশ্য রবিবাবু এসব উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, শোনো কথা! আমি তো ছাত্র রাজনীতি করিনেকো! সত্যি কথাই বটে!

কপিকনিক

এই শব্দের দুটো ব্যাসবাক্য। একটা হল— কপি দিয়ে পিকনিক, অন্যটা— কপিগম্য পিকনিক। মানে এমন পিকনিক স্পট, যেখানে পা রাখার জন্য কপিকুলের মতো ফিটনেস দরকার। এইসব স্পটে হ্যাপিকনিক, মানে হ্যাপি পিকনিক 'অওসম্ভব'! তা তিন তিনটে নদীর মিলনস্থলে, অপূর্ব পরিবেশে পড়ে থাকা নিশানডোবা পিকনিক স্পট চালু হওয়ার পক্ষকালের মধ্যে হ্যাপিকনিকের বদলে দ্বিতীয় অর্থে কপিকনিকডিগ্রি লাভ করেছে। যদি মনে করেন চড়ুইভাতির আগেই গাড়ি উলটে, ডিগবাজি খেয়ে, ঘেমে-নেয়ে বিনা তরলে টালমাটাল হবেন, তবে আপনার জন্য সেরা জায়গাও বটে নিশানডোবা। আহা! সেথা পৌঁছাবার শেষ পথটুকু কী 'অওসামান্য'! জমি নিয়ে কী জানি কী গোলমালে শেষ পথটুকু আর তৈরিই হয়নি। প্রকৃতি যেমন রেখেছিল, তেমনই আছে। ফলে স্পটে ঢোকার আগে খাবি খেয়ে পিকনিক পার্টি তুরন্ত গাড়ি ঘুরিয়ে পালাচ্ছে। হ্যাপিকনিক স্পট হবে জেনে এলাকার যাঁরা টু পাইস কামাবেন বলে গালে

হাত দিয়ে বসে ছিলেন, তাঁদের হাত গালেই থেকে যাচ্ছে। তা তিরিশ বছর আগে ডুয়ার্সের পিকনিক স্পটে যেতে গেলে ড্রাইভার অন্তত একজোড়া স্টেপনি নিয়ে যেত। নিশানডোবায় বোধহয় ছ'টা লাগবে।

গন্ডপ্রেম

জলদাপাড়ার ডাকসাইটে মস্তান গন্ডার বাঁয়া গণেশ (জুনিয়র) ইদানীং বেজায় শান্ত চিত্তে ঘাসপাতা খাচ্ছে। পাহাড়ের ভিউ দেখছে।

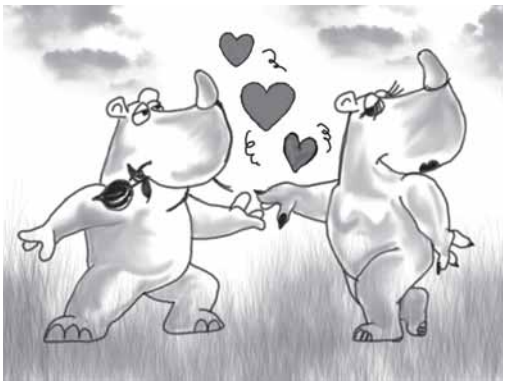

রোমান্টিক গান গাইছে। এমনকি কবিতা লেখারও চেষ্টা করছে বলে জানা গেল। জঙ্গল সাফারিতে যাওয়া হাতিদের গুঁতাবার ব্যাপারে এখন তার কোনও আগ্রহ নেই। পাশ দিয়ে গেলেও চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তা দস্যু থেকে এহেন বাল্মীকি বনে যাওয়ার নেপথ্যে অবশ্যি প্রেমের শান্তিদায়ক মলমের বিরাট ভূমিকা। সম্প্রতি তার একজোড়া গার্লফ্রেন্ড জুটেছে। তাই জুনিয়র বাঁয়া এখন গভীর প্রেমে মগ্ন। সাফারিতে যাওয়া হাতিরাও স্বস্তিতে। যতদিন দুই সতিনে গোলমাল না বাধে, তদ্দিন জলদাপাড়ার বনকর্মীরাও টেনশনহীন। বাপ রে! এদ্দিন যা তুর্কি নাচন নাচিয়েছে জুনিয়র বাঁয়া! তুই শান্ত থাক বাপ! দরকারে আরও একজোড়া প্রেমিকা আনা যাবে'খন।

আই ফোন

সাবধান! এ হল নতুন আই ফোন। মানে সিবিআই ফোন। কারা জানি সিবিআই-এর নামে ফোন করে মন্ত্রী গৌতমবাবুকে দেখা করতে বলেছে! আরও কারা কারা জানি পেয়েছেন এমন সিবিআই ফোন। দুর্জনরা বলছে যে, ফোন পেয়ে গৌতমবাবু নাকি কিঞ্চিৎ ঘেবড়ে গিয়ে এক জনসভায় নিজেকে নির্দোষ বলে খুব বক্তৃতা দিয়ে লোকজনকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তা বাবু গৌতম সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তিনি জোর পাত্তা লাগিয়েছেন ভুয়ো ফোনকারীর সন্ধানে। কালীঘাটে হায়েস্ট কমান্ডেও জানিয়ে দেবেন সময়মতো। তা শিলিগুড়ির পুর বোর্ড দখল নিয়ে যে কেলো শুরু হয়েছে, তাতে ও পক্ষের কেউ দুষ্টুমি করেনি তো? পাঠক! হাসবেন না! পরের ফোনটা হয়ত আপনারই মোবাইলে রি-রি-রিংংংংংং!

বেশ বেশ

খড়িবাড়িতে হাই স্কুলের খেলার মাঠে চমৎকার ড্রেসিং রুম আর সে রুমে টয়লেট বানিয়ে দিয়েছে গম্মেন্ট। শুনে ভারী আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু হায় ক্ষণস্থায়ী আনন্দ! এর পরেই জানলাম, টয়লেট হয়েছে বটে, তবে সেপটিক ট্যাঙ্ক নেই, আর গোটা শৌচাগারটা জলহীন। জেনে তো প্রায় মূর্ছা যাচ্ছিলাম আর কী! এহেন ট্যাঙ্কহীন, জলহীন শৌচাগার নাকি মন্ত্রী এসে ওপেন করেও গিয়েছেন। যাব্বাবা! দায়িত্বপ্রাপ্তরা শুনে আমতা আমতা করে জানিয়েছেন, মোটে পাঁচ লক্ষ টাকায় এতসব হয় নাকি? হয় না, সেটা বাপু বুঝলাম! কিন্তু ট্যাঙ্ক আর জল ছাড়া শৌচাগারের প্ল্যান পাশ করল কোন মহাত্মা? তবে সব জেনে পঞ্চায়েতপ্রধান খুব রেগে গিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি নাকি ট্যাঙ্ক বানিয়ে সেটারও উদ্‌বোধন করা হবে। জলও আসবে বন্যার মতো! তা-ই নাকি? বাঃ! বেশ বেশ!

রাস্তা লেবেন, রাস্তা

এইরকম ডাক নাকি ওদলাবাড়িতে গেলে হামেশাই শোনা যায়। মনে করুন আপনি সেখানে একটা গ্যারেজ খুলে ব্যবসা শুরু করবেন। আপনার চাই জমি। আপনি জমির খোঁজ শুরু করতেই দেখলেন কারা জানি দেঁতো হেসে বলছে, আরে মশাই, ওদলাবাড়ির নিয়ম হল, গ্যারেজ হবে

রাস্তায়। এ ক্ষেত্রে রাস্তাই জমি, জমিই রাস্তা। ইচ্ছেমতো খানিকটা জাতীয় সড়ক দখল করে দোকান চালু করে দিলেই হল। পথের গাড়ি পথে বসে সারাবেন— এটাই তো স্বাভাবিক। তাই সেখানে রাস্তা জুড়ে গ্যারেজ তুলে জমিয়ে ব্যবসা করার খাসা নিয়ম চালু। এতে জ্যামজট হয় ঠিকই, তা বলে রাস্তা থেকে গ্যারেজ সরিয়ে নিয়ে যায় কোন আহাম্মক? চলতি গাড়ির গুঁতোয় গুটিকয়েক গ্যারেজ কর্মী পরপারে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে গ্যারেজের কী দোষ? প্রশাসন সব শুনে গোঁফ চুমড়ে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বটেক! দেখা যাক। নইলে চুপিচুপি কাঠা দুয়েক জাতীয় সড়ক কিনে রাখতে হবে গ্যারেজ খোলার জন্য।

ওরে বাবা

শিলিগুড়ির তিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের মাটির নিচে তলে তলে এ কী কাণ্ড রে বাপৈ! বাসিন্দারা ভেবে আকুল! কাউন্সিলরের মাথায় হাত! তা কাকা, ভাবার মতোই কেস, বুইলে? অন্দর মে ইন্দুর! রাশি রাশি ইঁদুর তিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের মাটির নিচে। তারা মহানন্দে খুঁড়ে ফেলেছে একের পর এক সুড়ঙ্গ। ফলে, বলা নেই কওয়া নেই, ধাঁই করে বসে যাচ্ছে মাটি। সাধের মেঝেতে রাতারাতি বিচ্ছিরি ফাটল। ধুপুস করে বসে যাচ্ছে কালভার্ট। খাটো হয়ে যাচ্ছে প্রাচীর। ভেঙে পড়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। সব শুনে চুল কিঞ্চিৎ খাড়া হয়ে গিয়েছে পুর প্রশাসনের। প্রচুর তল্লাশি চালিয়েও কোনও উপায় মিলছে না। তবে ঘাবড়ে না গিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, সবুর করুন! বাঁশিওয়ালা একখানা ঠিক খুঁজে বার করব। কিন্তু তদ্দিন ওয়ার্ডের বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকলে হয়! বাবা রে!

টুক্রাণু

জল্পেশে জ্যামজট কাটাতে নতুন রাস্তার কাজ শুরু। দার্জিলিং যেতে গিয়ে টয় ট্রেনের মিনি ডিগবাজি। অপছন্দের কারণে জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএম আপিসে যুব সম্পাদকের মুখে দুরন্ত ঘুসি এক সদস্যের। ইটাহারের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সারাদিনে মোটে দেড় ঘণ্টা খোলা থাকে। কড়াকড়ি সত্ত্বেও গাঁজা চাষ কেন বাড়ছে, সে নিয়ে ভারী টেনশনে কোচবিহার প্রশাসন। এক মাসে এক কোটি আয় করে ফেলল এনবিএসটিসি-র জলপাইগুড়ি ডিপো। রায়গঞ্জে গ্রেপ্তার হওয়া চিতা মুক্তি পেল মহানন্দা অভয়ারণ্যে। আচমকা বাদলের ধারাপাতে ডুয়ার্সে সরষে চাষিরা চোখে সেই ফুল দেখেছেন। সোঁদরবন থেকে বাঘমামা শিলিগুড়িতে এলেন। নাগরাকাটার সব ক্লাবের নতুন বছরের রেজোলিউশন হল, সমাজের ভাল করব। 'হেরিটেজ' হবে জেনে রেগে লাল বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী।

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Contact 9830410808, 033 6536 0463

কামতাপুরের হদিশ বহু বাকি খননকার্য আরও দ্রুত হোক

কামতাপুরীর ইতিহাস মানুষের স্মৃতিতে অনেকটাই বিবর্ণ। গোসানিমারি অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আজও সঠিকভাবে শুরু হয়নি। প্রাক খেন যুগের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই, এমনকি কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে ধারণাও পুরোপুরি পাল্টে যেতে পারে বলে অনুমান।

ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের গৌরবময় ইতিহাস গাথা এবং উপগাথা দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সর্বজনগ্রাহ্য সত্য তুলে আনা কঠিন থেকে কঠিনতর। উত্তরবঙ্গের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন মন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রকাশের আকারে বিরাজ করছে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় আর্য সভ্যতা বিকাশের পূর্বে যে একটি দ্রাবিড় নগররাষ্ট্র ছিল তা আজ পরীক্ষিত সত্য। অতীত ইতিহাসকে খুঁজতে গেলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উত্তরের পুরাকীর্তিগুলি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালালেই প্রাচীন ইতিহাসের নানান ছবি ভেসে ওঠে। কোচবিহার রাজ্যের বিলুপ্ত রাজধানীগুলির কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সুপ্রাচীন রাজধানী কামতাপুরের কথা। অতীতের প্রাচীন কামতাপুর রাজ্যের এক বিশিষ্ট অংশ হল কোচবিহার জেলা, যা ইংরেজ আমলের কোচবিহার রাজ্য। রাজা নীলাম্বর ছিলেন কামতাপুরের রাজা। প্রাচীন কামতাপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল কামতাপুর শহর, যার পরিধি ছিল সাড়ে এগারো ক্রোশ। প্রায় সাত ক্রোশ বেষ্টিত ছিল নগরীর প্রাচীর। আড়াই ক্রোশ একটি নদী দ্বারা এটি রক্ষিত ছিল। প্রাচীরের ভিতর গড়ের মধ্যে ছিল রাজপুরী। কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা শহর থেকে প্রায় ১০ কিমি পশ্চিমে এখনকার গোসানিমারি গ্রামটি ছিল কামতাপুর শহরের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল। এই জনপদের যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে, তার কালপরিমাণ ৫০০ বছর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেন রাজা নীলধ্বজ কামরূপ থেকে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিশাল রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কামতেশ্বর উপাধি নেন এবং কোচবিহারের অদূরে কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। দেবী কামতেশ্বরী ছিলেন তাঁদের আরাধ্যা দেবী। তাঁর পুত্র নীলাম্বর বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। কিন্তু নীলাম্বরের আমলেই বাংলার সুলতান হুসেন শাহের হাতে খেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তথা প্রান্তিক উত্তরবাংলায় একটি স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী রাজ্য শাসনের অভাব খ্রিস্টোত্তর প্রথম শতকের প্রথম ভাগেই অনুভব করা গিয়েছিল। বাংলার পাল শক্তি নিঃশেষিত হবার আগে কামরূপকে শেষবারের মতো আঘাত করেছিল। পাল বংশের স্থলাভিষিক্ত সেন বংশও কামরূপে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছিল। উমাপতি ধরের ‘দেওপাড়া প্রশস্তি’ সেন শৌর্যের জয়গান করলেও সেন সামরিক অভিযানের পূর্ণ স্থায়ী সাফল্য দাবি করতে পারেনি। কিন্তু শক্তিধর রাষ্ট্রের আক্রমণে করতোয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যে জনজীবন বেড়ে উঠেছিল, সে প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়বে তা অনুমান করাই যায়। খ্রিস্টোত্তর দ্বাদশ শতকের শেষ পর্বে রাজা পৃথুর নেতৃত্বে করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নতুন করে রাষ্ট্রবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে জনজীবনকে আবার সংগঠিত করবার আয়োজন হতে না হতেই দিল্লির সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে আগ্রাসী হস্ত প্রসারিত করতে থাকে। এইভাবে ১২০৬ থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সাতবার লক্ষ্মণাবতীর অশ্বারোহী সৈন্যদল করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আঘাত হানবার চেষ্টা করে। পরবর্তী মোগল আমলে মিরজুমলা, ইসলামীয় শাসনে বখতিয়ার খিলজি-সহ কামরূপ অভিযান যে কারণে ব্যর্থ হয়, সেই কারণেই গৌড়ের অভিযানও কামরূপে ব্যর্থ হয়। নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত করতোয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং খরস্রোতা নদী কোনও অশ্বারোহী অভিযাত্রী বাহিনীর পক্ষে অবাধ পরিক্রমার ক্ষেত্র হতে পারে না। তবে প্রায় নিয়মিত বহিরাক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীভূত শাসনে বেঁধে মানুষকে রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় আনবার সুযোগ না থাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং গোষ্ঠীপতিরা নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের চারের দশক থেকে খেন গোষ্ঠী কামতাপুরে খেন শাসন প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়।

অহম ভাষায় ‘খুন’ বা ‘খেন’ দু’টি শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ ‘উত্তম’। ‘অহম বুরুন্ডি’, আমানতুল্যা চৌধুরীর ‘কোচবিহারের ইতিহাস’, বুকানন-হ্যামিলটনের রিপোর্ট, রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী প্রণীত ‘গোসানিমঙ্গল কাব্য’, কোচবিহার গেজেট, ই এ গেটস সাহেবের ‘কোচ কিংস অব কামরূপ’ গ্রন্থ, খেন সমাজপ্রণেতা ‘রাজমোহন দাসের পুস্তিকা’, প্রাচীন জমির দলিল থেকে খেন সমাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। অবিভক্ত বাংলায় খেন জনজাতির বসতি ছিল তথাকথিত কামতাপুর রাজ্যের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, এমনকি বর্তমান অসমের পশ্চিমাঞ্চল, গোয়ালপাড়ায়। খেন রাজাগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল পশ্চিমে ঘোড়াঘাট, পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণে বগুড়ার উত্তর সীমা ও উত্তরে ডুয়ার্স অঞ্চলে। অবিভক্ত বঙ্গদেশের পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কামতাপুর রাজ্য স্থাপনের মাধ্যমে স্বল্পকালীন শাসনের ইতিহাস রহস্যাবৃত।

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে খেন জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সত্তা খুঁজে পাবার আগে বোড়ো জনজাতির বৃহত্তর জীবনের অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। ভাষা সংস্কৃতির মতো তাদের আচার-আচরণ, ধর্মীয় পূজা অনুষ্ঠান এবং দীর্ঘ ৫০০ বছর সমতলে অবস্থানের গুণে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল। যদিও গোষ্ঠীজীবনের পুরাতন কিছু লোকাচার ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয়নি। খেন জনজাতি হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে ভুটানের পার্বত্য উপত্যকায় তিব্বতি অভিযানের ফলে ঘরছাড়া হয়। পাহাড় থেকে অবতরণ করে সমতলে তারা কোথায় বসতি স্থাপন করেছে তা সুনিশ্চিতভাবে বলবার উপায় নেই। তবে তাদের রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভ হবার পর কিছুকালের জন্য হলেও খেন জনগোষ্ঠী সুসংহত হতে পেরেছিল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভ হওয়ার আগে কয়েক শতক জুড়ে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের যে বিবর্তন ঘটছিল, তার প্রভাব থেকে খেন জনজাতিও দূরে থাকতে পারেনি।

সুপ্রাচীন কামতাপুর রাজ্যে মধ্যযুগে বারে বারেই মুসলিম অভিযান হলেও সংগঠিত হিন্দু রাজশক্তি বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। উত্তরের এই ভূখণ্ডে কামরূপ-কামতাপুরে বারংবার আক্রমণের নেপথ্য কারণই ছিল সংগঠিত হিন্দু রাষ্ট্রের

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে খেন জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সত্তা খুঁজে পাবার আগে বোড়ো জনজাতির বৃহত্তর জীবনের অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। ভাষা সংস্কৃতির মতো তাদের আচার-আচরণ, ধর্মীয় পূজা অনুষ্ঠান এবং দীর্ঘ ৫০০ বছর সমতলে অবস্থানের গুণে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল। খেন জনজাতি হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে ভুটানের পার্বত্য উপত্যকায় তিব্বতি অভিযানের ফলে ঘরছাড়া হয়।

ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং বারংবার বিদেশি মুসলিম অভিযানের ব্যর্থতা। মুসলিম শাসনের প্রথম ২১ বছর লক্ষ্মণাবতী নয়, দিনাজপুরের দেবকোট ছিল মুসলিম রাজশক্তির প্রধান ঘাঁটি। উত্তরবঙ্গ অভিযানে মহারাজ পৃথুর হাতে বখতিয়ারের সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হলে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েন যে, পরবর্তীকালে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দেবকোটে প্রয়াত হন। ১২১১ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ সিংহাসনে বসে ১৫ বছর রাজত্ব করেন। আনুমানিক ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিস গৌড় আক্রমণ করলে গিয়াসউদ্দিন বার্ষিক কর দেবার শর্তে সন্ধি করে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করেন। ইলতুৎমিস দিল্লি ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিসের প্রতিনিধি নাসিরউদ্দিন ইউয়জকে পরাস্ত করে সিংহাসনে বসেই, কামরূপ অভিযান করে সন্ধ্যা রায়কে পরাজিত করে সামরিক সাফল্য লাভ করলেও, তাঁর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপ স্বাধীন হয়ে যায়। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মারা যাবার পর গৌড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়। ১২২৯-১২৫১ পর্যন্ত গৌড় লক্ষ্মণাবতীতে কোনও মুসলিম শাসক দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে পারেননি। ইখতিয়ারউদ্দিন উজবেগ অযোধ্যার শাসনকার্যের পাশাপাশি লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হলেও, ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে কামরূপ আক্রমণে গিয়ে পৃথুর পুত্র সন্ধ্যা রায়ের হাতে ব্যাপকভাবে পরাজিত হন। মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যত শাসনকর্তা লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে বসেছেন, তাঁদের আমলে লক্ষ্মণাবতীর শাসন প্রত্যাশিত গতিতে চারদিকে প্রসারিত হয়নি। এই উর্বর পাললিক ভূখণ্ডের দখল নিয়ে শাসকশ্রেণির মধ্যে অন্তহীন কোন্দল দেখা দিয়েছিল। ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে তুঘ্রল খাঁ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন দখল করে উত্তরবঙ্গ কামরূপ অভিযান করেন, রাঢ়ে আধিপত্য স্থাপন করেন, পূর্ববঙ্গেও মুসলিম শাসন বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজের নামে খুদবা প্রচার এবং মুদ্রা প্রচলন করলে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তিন লক্ষ সৈন্য এবং বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে লক্ষ্মণাবতী দখল করেন। নিজের পুত্র বুখরা খাঁ-কে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিয়োগ করে বলবন ফিরে গেলে, ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ লক্ষ্মণাবতী দখল করার আগে পর্যন্ত গৌড়-বরেন্দ্র এবং লক্ষ্মণাবতীর ইতিহাসে একটি বংশের সুলতানি স্থাপিত হল। ইলিয়াসশাহি বংশে সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে রাজা গণেশ সিংহাসন দখল করেন, এবং

মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যত শাসনকর্তা লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে বসেছেন, তাঁদের আমলে লক্ষ্মণাবতীর শাসন প্রত্যাশিত গতিতে চারদিকে প্রসারিত হয়নি। এই উর্বর পাললিক ভূখণ্ডের দখল নিয়ে শাসকশ্রেণির মধ্যে অন্তহীন কোন্দল দেখা দিয়েছিল। ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে তুঘ্রল খাঁ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন দখল করে উত্তরবঙ্গ কামরূপ অভিযান করেন, রাঢ়ে আধিপত্য স্থাপন করেন, পূর্ববঙ্গেও মুসলিম শাসন বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন।

ইলিয়াসশাহি বংশের রাজত্বের অবসান হয় ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে। ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে গণেশের বংশধরদের শাসন বাংলা থেকে অবলুপ্ত হলে গৌড়-বরেন্দ্রে হাবসি শাসন শুরু হয়। এর পর হুসেনশাহি বংশের রাজত্বের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে হাবসি ক্রীতদাসদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। হাবসি পর্বের রক্তাক্ত শাসনের অবসান ঘটাতে গৌড়ের প্রধান ওমরাহ এবং আমিররা সৈয়দ হোসেনকে সিংহাসনে বসালে তিনি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ নাম ধারণ করে। প্রতিভাবান, যোদ্ধা, সুশাসক, প্রজাদরদি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হোসেন শাহের আমলে গৌড়-বরেন্দ্রে শান্তি ও প্রাচুর্য ফিরে আসে। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ কামতাপুর আক্রমণ করেন, এবং বহুকালের হিন্দু রাজধানীর পতন ঘটান। বিজয়ী সৈন্য ব্রহ্মপুত্র তীর পর্যন্ত গমন করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অহম শক্তির হাতে মুসলিম সৈন্যগণ বিতাড়িত হয়।

সুপ্রাচীন কামতাপুর রাজ্যে মধ্যযুগে হুসেন শাহের সময়ে যাঁরা রাজত্ব করতেন, তাঁরা ছিলেন খেন বংশের রাজা। চক্রধ্বজ, নীলধ্বজ এবং নীলাম্বরদের পতনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় সুপ্রাচীন কামতাপুর রাজবংশ এবং রাজধানী। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ চক্রধ্বজের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নীলাম্বর কামতাপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে গৌড়বঙ্গে হাবসি ক্রীতদাসদের রাজত্ব চলছিল ক্রমাগত হানাহানি, ষড়যন্ত্র এবং দুঃশাসনের মধ্যে দিয়ে। গৌড়ের এই রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে নীলাম্বর পিতৃরাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেন, এবং তার ফলে পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ তাঁর অধিকারে আসে। নীলাম্বর গৌড় রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অংশের বিস্তৃত ভূভাগ তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত করে নিয়েছিলেন। একদিকে রাজ্য বিস্তার, অন্য দিকে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি দিয়ে তিনি নিজেকে সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী ও ক্ষিপ্র করে তুললেন। কামতাপুর থেকে গৌড় সীমান্তে অবস্থিত ঘোড়াঘাট দুর্গ পর্যন্ত তিনি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। বঙ্গবিভাগের পূর্বে কোচবিহার রংপুর হয়ে যে রাস্তাটি বগুড়া পর্যন্ত যেত, সেটাই ছিল নীলাম্বর নির্মিত প্রশস্ত রাস্তা। নীলাম্বরের শাসনের প্রথম ১৪ বছর খেন শাসনের জাগৃতির কাল। কিন্তু শেষ চার বছর দুর্ভাগ্য ও ১৪৯৮ সালটি পতনের কাল।

কোচবিহার জেলার মহকুমা শহর দিনহাটা থেকে প্রায় আট-দশ কিমি পশ্চিমে শীতলকুচি যাওয়ার পথে আদাবাড়ি ঘাট সংলগ্ন অঞ্চলই হল গোসানিমারি। এখানেই বর্তমানে অবস্থিত গোসানিমারি বাজারে এসে পৌঁছালাম। বাজারের দক্ষিণাংশেই অতি প্রাচীন গোসানি মন্দির। যদিও মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের শাসনকালে, ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মন্দিরটি জনসমাজে কামতেশ্বরের মন্দির নামে পরিচিত এবং দেবীর নাম কান্তেশ্বরী। সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম সুহৃদ দীপক, বাবলু, পার্থ। নিছকই কোচবিহারে বেড়াতে এসে দিনহাটা চলে আসা। আর দিনহাটাতে এসে গোসানিমারি রাজপাট যাব না তা কি হয়? হিতেন নাগের বাড়িতে বসে হিতেনদারই প্রতিবেশী নগেনদার কাছ থেকে গোসানিমারির বহু অনুল্লিখিত ইতিহাস জানা গেল। হিতেনদার কাছ থেকে জানলাম, কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে গোসানিমারিতে খেন বংশের রাজারা রাজ্য শাসন করতেন। সেই রাজাদের নানান কীর্তিকলাপ নিয়ে জনসমাজে প্রচলিত ছিন্নভিন্ন কাহিনিকে একত্রিত করে গ্রন্থাকারে লিখিত হয় 'গোসানীমঙ্গল কাব্য'। প্রণেতা কবি রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী। 'গোসানীমঙ্গল' কোচবিহারের আদিকাব্য। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বুকানন হ্যামিলটন গ্রন্থটি শ্রবণ করে রাধাকৃষ্ণদাসের গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও তা রচনাকালের দিক দিয়ে অত্যন্ত আধুনিক। 'গোসানীমঙ্গল কাব্য'টি না-ই বা হল কোচবিহারের আদিমতম গ্রন্থ। কিন্তু কোচবিহার তথা কামতাপুরের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তৎকালীন সমাজচিত্র, রাজা-মহারাজের জয়-পরাজয়ের কাহিনি স্থানীয় পরিবেশ যেভাবে এই গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে, সেদিক দিয়ে বিচার করলে প্রাচীন ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দীপক, পার্থ, হাবলু ও আমি— এই চার মূর্তির জন্য হিতেনদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিল। গোসানিমারির কামতেশ্বররাজ নিজের রাজধানীকে সুরক্ষিত রাখতে রাজধানীর তিনদিকে পরিখা খনন করে এমন গড় নির্মাণ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন কামতাপুরী নগরীর ইতিহাস জানতে পেরে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলাম। ইতিহাসের ছাত্র দীপক নিগমনগরেরই ছেলে। দীপকের জবানিতে জানা গেল— বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত এক ধরনের আখ্যানকাব্যকে বলা হয় মঙ্গলকাব্য। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই লক্ষ করা যায়, দেবী তাঁর পূজা প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থানের নির্দিষ্ট জনজাতির মধ্যে

সুপ্রাচীন কামতাপুর রাজ্যে মধ্যযুগে হুসেন শাহের সময়ে যাঁরা রাজত্ব করতেন, তাঁরা ছিলেন খেন বংশের রাজা। চক্রধ্বজ, নীলধ্বজ এবং নীলাম্বরদের পতনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় সুপ্রাচীন কামতাপুর রাজবংশ এবং রাজধানী। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ চক্রধ্বজের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নীলাম্বর কামতাপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে গৌড়বঙ্গে হাবসি ক্রীতদাসদের রাজত্ব চলছিল ক্রমাগত হানাহানি, ষড়যন্ত্র এবং দুঃশাসনের মধ্যে দিয়ে। গৌড়ের এই রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে নীলাম্বর পিতৃরাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেন, এবং তার ফলে পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ তাঁর অধিকারে আসে।

স্বমহিমায় উপস্থিত হন। এর পর শুরু হয় সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে সেই স্থানের জনজাতির কিছু চরিত্র, নদনদী ও পারিপার্শ্বিক ভূপ্রকৃতি। মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শীতলা, বাসুলী, শিব ইত্যাদি প্রভাবশালী দেবদেবী ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে আরও কিছু দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বেশ কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক অন্যতম সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল মঙ্গলকাব্য। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের ভঙ্গিমায় লিখিত 'গোসানীমঙ্গল কাব্য'

বিষয়বৈচিত্রের দিক থেকে পরিপূর্ণ মঙ্গলকাব্য না হলেও, বাস্তব পটভূমিতে লিখিত আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় এই গ্রন্থটির অবদান ব্যাপক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষক হাবলু কোচবিহারের ছেলে হলেও দিনহাটার ইতিহাস, বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির ইতিহাস ভালোই জানে। খেন রাজবংশ, কোচ রাজবংশ, ইংরেজ শাসনকালের কোচবিহারের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তন নিয়ে হাবলুর পড়াশোনা উপেক্ষা করার মতো নয়। হাবলুর মতে, খেন রাজত্ব সম্পর্কে লৌকিক কাব্য গোসানীমঙ্গলে কিছু তথ্য আছে। পয়ার এবং ত্রিপদীতে বর্ণিত এই 'গোসানীমঙ্গল কাব্য' জনশ্রুতিনির্ভর একটি কাব্য, যদিও ইতিহাসের ছায়া এখানে পড়েছে। খেন রাজত্বকালের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস রচনাকারী রাধাকৃষ্ণদাস অধিকারী কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মানুষ। রাধাকৃষ্ণ খেন শাসকদের এক পুরুষের কাহিনি দিয়েছেন, যে কাহিনিতে একসঙ্গে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ও সমাপ্তির ঘটনা বিধৃত।

বাংলার পাল এবং সেন যুগের মতো কামতাপুরের খেন যুগের এমন কোনও দানপত্র নেই, যার উপর নির্ভর করে কামতাপুরের ধন উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। তবে নদীবহুল দেশ এবং পরিমিত বৃষ্টিপাতের জন্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের সম্ভাবনা কম ছিল না। করতোয়ার পশ্চিমে বাংলার পুণ্ড্রবর্ধনের শস্যশ্যামল প্রান্তর করতোয়ার পূর্ব ভাগেও যে নয়নাভিরাম দৃশ্য তৈরি করবে— এটা কিছু কষ্টকল্পনা নয়।

হাবলুর মতে, বাংলার পাল এবং সেন যুগের মতো কামতাপুরের খেন যুগের এমন কোনও দানপত্র নেই, যার উপর নির্ভর করে কামতাপুরের ধন উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। তবে নদীবহুল দেশ এবং পরিমিত বৃষ্টিপাতের জন্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের সম্ভাবনা কম ছিল না। করতোয়ার পশ্চিমে বাংলার পুণ্ড্রবর্ধনের শস্যশ্যামল প্রান্তর করতোয়ার পূর্ব ভাগেও যে নয়নাভিরাম দৃশ্য তৈরি করবে— এটা কিছু কষ্টকল্পনা নয়।

খেন উত্তরভূমির এক আদিম জনগোষ্ঠী। কোচ রাজ্যে ঐতিহাসিক পর্যটক বুকানন যখন পদার্পণ করেন, তখন তিনি যে নৃতাত্ত্বিক বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, খেনরা ছিল ফরসা, উঁচু নাক এবং টানা চোখবিশিষ্ট। হান্টারের মতে, খেন জাতি ক্ষত্রিয়দের বংশধর। খেন জাতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কোনও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হয়নি বলে অনেকে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক মিল খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেও বাস্তবে এদের কোনও নৃতাত্ত্বিক মিল নেই। সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয় এবং খেনদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

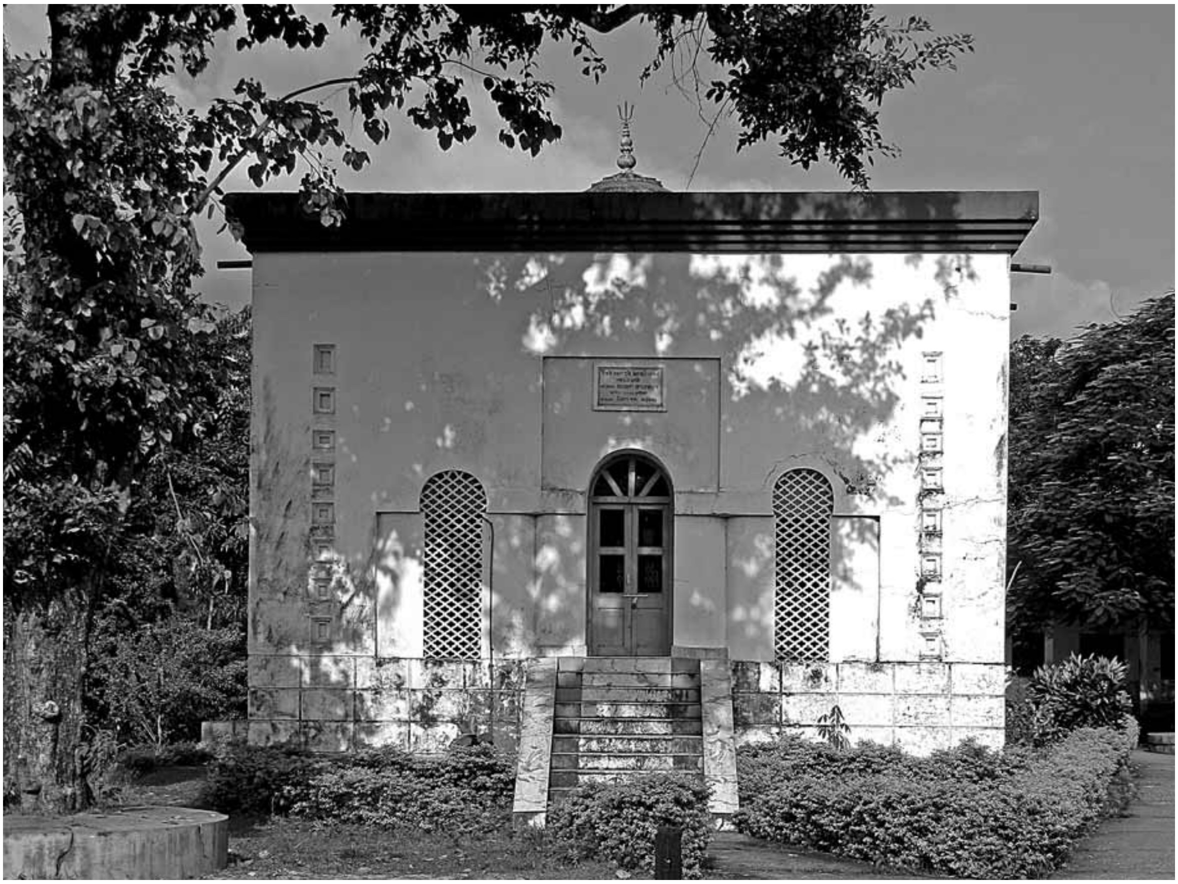

ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে উত্থান এবং পতনের অনিবার্য নিয়মেই খেন জাতি আজও প্রায় অবলুপ্ত। খেন রাজাদের পতনের পর কোচ রাজবংশের দীর্ঘ রাজত্বের ফলে উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনের সর্বত্র রাজবংশীদের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। তাদের সংস্কৃতি, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান রাজকীয় ক্ষমতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলে লুপ্ত হতে থাকে খেন জাতির সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র।

আবহমানকাল থেকে একসঙ্গে বসবাস করার ফলে যেভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান হওয়ার কথা, সেটুকুই হয়েছে মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খেন জাতির সংসার পুরুষপ্রধান। কোচ বা মেচ পরিবারের সংসার যে মাতৃতান্ত্রিক ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজবংশী এবং ক্ষত্রিয় সমাজের পদবি দিয়ে গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু খেন সম্প্রদায়ের মানুষকে পদবি দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না।

ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে উত্থান এবং পতনের অনিবার্য নিয়মেই খেন জাতি আজও প্রায় অবলুপ্ত। খেন রাজাদের পতনের পর কোচ রাজবংশের দীর্ঘ রাজত্বের ফলে উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনের সর্বত্র রাজবংশীদের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। তাদের সংস্কৃতি, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান রাজকীয় ক্ষমতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলে লুপ্ত হতে থাকে খেন জাতির সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র। কোচবিহার তথা বরেন্দ্রভূমিতে খেন জাতি দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী হলেও তাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। এর জন্য খেন সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা সমাজ অনেকাংশে দায়ী। ভারতের বিভাজিত সমাজজীবনে তারা অনুন্নত এবং নীচ হিসেবে আখ্যা পেয়ে এসেছে— ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর কামতাপুরের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে মানুষের মন থেকে মুছে গেলেও দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি এবং তার আশপাশের গ্রামে এখনও পড়ে আছে ভাঙাচোরা কিছু স্মৃতিচিহ্ন। কোচবিহারের অন্তর্গত গোসানিমারি অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আজও সঠিকভাবে শুরু হয়নি। সঠিক অনুসন্ধানে প্রাক্-খেন যুগের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই, এমনকি কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পুরোপুরি পালটে যেতে পারে এমন কল্পনাও অসমীচীন নয়। গোসানিমারির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একই সঙ্গে দুই প্রকারের নির্মাণশৈলীর প্রত্নমূর্তিগুলির অবস্থান বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি আলোকপাত করে। এই ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সিতাই, শীতলকুচি, মাথাভাঙা থানার নিম্নাংশে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের মূর্তিগুলির নির্মাণশৈলী খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে পাল এবং উত্তর-পাল যুগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলির সঙ্গে বোদা, পাটগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা পৃথু রাজার গড়ের যে মেলবন্ধন ছিল তা-ও প্রমাণিত। অপর দিকে, ধ্বংসাবশেষের উপর রক্ষিত পাষাণ স্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবে প্রাপ্ত ধূসর বেলেপাথরের তৈরি মূর্তিসংবলিত প্রস্তরখণ্ডগুলি তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গৌতম চক্রবর্তী

বাম আমল থেকেই কলেজ প্রাঙ্গনে দুর্বৃত্তায়ন অধুনা পরিণত তোলাবাজি দখলদারির লড়াইতে

সারা বাংলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তরের কলেজে কলেজে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বলে যা খবরে প্রকাশ তা যে আসলে ক্ষমতাসীনদের চেপে রাখা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফেটে পড়া বহিঃপ্রকাশ সে কথা অজানা নয় কারোরই। যুযুধান গোষ্ঠী দু' পক্ষই শক্তিশালী হলে দ্বন্দ্বের মাত্রা ও তীব্রতা বাড়ে, আর এক পক্ষ দুর্বল হলে ওয়াক ওভার। সনাতনী কংগ্রেসী সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রেখে বামহীন বাংলায় কলেজে কলেজে টিএমসিপি বনাম টিএমসিপি— রাজ্যের ছাত্ররাজনীতিতে নতুন অধ্যায় রচনায় প্রভূত রসদ যোগাবে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কলেজ প্রাঙ্গনে দুর্বৃত্তের দখলদারি নিয়ে মানুষ আজ আর অবাক হয় না। কারণ এর সূচনা হয়েছিল বহু আগেই।

আজ থেকে আঠাশ বছর আগেকার কথা। রাজ্যের প্রত্যন্ত জেলার একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত সরকারি কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের দিন। নির্ধারিত সময় ধরে নেওয়া যাক বেলা একটা থেকে বিকেল চারটে। বছর দশেক ধরে সেই ছাত্র সংসদ দখল করে আসছে শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই। তবে বিরোধীদের জোরও বাড়ছে। বেলা দশটা থেকেই দেখা গেল ধীরে ধীরে নিঃশব্দে

কলেজ বাউন্ডারি ঘিরে ফেলেছে অজস্র অচেনা মুখ। তারপর কলেজে বেরোবার বা ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ। নির্ধারিত সময়ে বারবার কখনও মিছিল করে কখনও নিঃশব্দে মনোনয়নপত্র তোলার চেষ্টায় কলেজে ঢোকার চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হল বিরোধী ছাত্রপরিষদের কর্মীরা। প্রত্যেকবার পাইপগান ও তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল অচেনা বহিরাগতরা। সেদিনই কলেজে আবার চলছিল পাস কোর্সের বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হল ছাত্র পরিষদ সমর্থকরা। কয়েকজনকে কিল-চড়-লাথি মারা হল, জনা দুয়েক তরোয়ালের খোঁচা খেল, কারও হাতের ঘড়ি ছিনতাই হল, প্রাণপণে দৌড়ে হস্টেলে ঢুকে বাঁচল তারা। তারপর মনোনয়পত্র তোলার সময় পেরিয়ে গেলে বীরবিক্রমে ফিরে গেল সেই বাহিনী। বিনা প্রতিযোগিতায় আরও এক বছর কলেজে ক্ষমতায় বহাল থাকল এস এফ আই। থাকাটা ভীষণ জরুরি ছিল, কারণ তারপরের বছরই ছিল কলেজের একশো বছর। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের নিয়ন্ত্রণ ও অর্থ দুই-ই হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সংশয় নিয়ে কি থাকা যায়?

এই ছোট্ট ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে সামান্যতম বিচ্যুতি থাকলেও চ্যালেঞ্জ জানাবার আহ্বান রইল। পাঠককে মনে রাখতে হবে, ঘটনাটির কয়েক মাস আগেই কিন্তু তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসেছে বামফ্রন্ট। ক্ষমতায় আসবার পরেই হস্টেলে, কলেজে, পথে-ঘাটে ছাত্র পরিষদকে সমর্থন করলে 'নির্মমভাবে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার' 'রুচিসম্মত' হুমকি চলেছে। ভরা বাজারে ছাত্র পরিষদ জেলা সভাপতিকে ঘিরে ধরে হাতে 'চকলেট পটকা' ধরিয়ে বাধ্য করা হয়েছে তা ফাটিয়ে বামফ্রন্টের 'জয়' উদ্‌যাপন করার জন্য। আর তার কয়েকমাস পরেই সেই শহরের যুব কংগ্রেসের এক সমাবেশে বিনা প্ররোচনায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে ঝকঝকে মেধাবী ছাত্র পরিষদ কর্মীর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দিয়েছে এক পুলিশ কর্তা। তার অপরাধ ছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো এবং সেই পুলিশ কর্তার দিকে তাকিয়ে স্লোগান দেওয়া। পাঠককে আরও মনে রাখতে হবে, দশ বছরের

মন মাতানো মন্দারমণি

মন্দারমণির সূর্য-ধোওয়া বালুচরে সমুদ্রের স্রোত যখন আছড়ে পড়ে, সমস্ত মনখারাপ যেন তার সঙ্গে ভেসে চলে যায়। জিভে জল আনা সামুদ্রিক মাছ দিয়ে মহাভোজ সারতে সারতে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মানুষ ভুলে যায় চাওয়া-পাওয়ার সব হিসেব। আর সূর্য ডোবার পালা এলে, মন্দারমণি জেগে ওঠে অন্ধকারে। তখন কান পাতলে শুধু সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

06Mo19BEN

শাসনকালে ততদিনে বাম সরকারের মুকুটে জুড়ে গিয়েছে মরিচঝাঁপির গণহত্যা এবং বিজন সেতুর সন্ন্যাসী হত্যার তকমা।

আজ যে বীজ সবার অলক্ষ্যে মাটিতে শেকড় গাঁথে, কাল যে তা বিষবৃক্ষে পরিণত হবে সে খেয়াল ছিল না আমাদের কারোরই। না হলে একবার তিন দশক আগেকার পত্রপত্রিকার পাতা একটু উলটে দেখুন না। বছরের পর বছর নমিনেশন তুলতে বা জমা করতে না দিয়ে 'ওয়াকওভার', স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির ভোটকে পুরোপুরি রাজনৈতিক রং দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, কোনও 'অনমনীয়' প্রধান শিক্ষককে দিনের পর দিন মানসিক নির্যাতনে দলের সিদ্ধান্ত মানতে বা স্কুল ছাড়তে বাধ্য করা, শিক্ষকদের কমন রুমকে বা ছাত্র সংসদের দফ্‌তরকে 'রাজনৈতিক ক্লাসঘর' বানিয়ে ফেলা, শিক্ষাক্ষেত্র তা সে প্রাইমারি স্কুল হোক বা ডাক্তারদের কলেজ হোক তাকে মেরে ধরে বিরোধী শূন্য করা, এমএলএ ও এমপি-দের শিক্ষকদের ও ছাত্রদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ নাক গলানো, ইত্যাদি অভ্যেস এই বাংলায় ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল? এ রাজ্যে ছাত্রদের শিক্ষক হেনস্থা-নিগ্রহ-অপমানের সূচনা ঠিক কবে হয়েছিল? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দিনের পর দিন লাঞ্ছনা, অপমান, হেনস্থার গল্প হয়তো নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জানা কিন্তু উচ্চশিক্ষায় অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, উপাচার্য, কর্মী নিয়োগ যে একশো শতাংশ রাজনৈতিক দলের নির্দেশে হত, প্রথিতযশা সব শিক্ষাবিদরা সিপিএম সদর বা জেলা দফ্‌তরের কিংবা নেতা-মন্ত্রীদের বাড়ির ওয়েটিং রুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন এসব খবরও নিশ্চয়ই অজানা নেই।

বামেদের আমলে রোপন করা বীজ যে পরবর্তী প্রজন্মে বিষময় পরিণাম সৃষ্টি করবে সে নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের কোনও সংশয় ছিল না। অতিষ্ঠ মানুষ নিরুপায় হয়ে পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু পরিবর্তনের সেই যুগসন্ধিতে প্রতিহিংসার আগুন ঠেকানো সম্ভব হলেও গজিয়ে ওঠা বিষবৃক্ষের গোড়ায় আঘাত করা হল না। অসংগঠিত শাসকদল ভরাট হল বেনোজলে ভেসে আসা পাঁক ও কাদামাটিতে। ফলে জীবাণুরা বহাল তবিয়তে থেকে গেল শাসকের সস্নেহ প্রশ্রয়ে। বেড়ালের গলায় আর ঘণ্টা বাঁধা হল না। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ফুটপাতের লাইসেন্সহীন হকার কিংবা রাজপথের বে-আইনি অটো বা টোটোর সঙ্গেই তোলাবাজদের তালিকায় ঢুকে গিয়েছে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান ডিগ্রি কলেজও। শাসক নীরব অবিচল। এলাকার বড় নেতাদের হাত আরও 'মজবুত' করতে পারলে আখেরে রাজ্যের সরকারও মজবুত হবে, এই অকাট্য যুক্তিকে খণ্ডন করার দুঃসাহস কি কারও আছে?

বহু পুরনো পরিচিত জনৈক 'প্রাজ্ঞ' শাসকদলীয় সমর্থকের কাছে পাওয়া গেল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। যাঁরা কলকাতার কন্ট্রোল রুমে বসে আছেন তাঁরা খুব ভাল করেই সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করতে পারছেন, তাঁরা সবাই চোখকান বুঁজে বসে রয়েছেন এমনটি ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীনদের 'প্রতিহিংসামূলক' চাপ যে পরিমাণে রয়েছে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তীব্রতা খবরের শিরোনামে এলে সুযোগ সন্ধানীরা অন্যরকমভাবে 'সক্রিয়' হয়ে উঠতে পারে সেই আশংকা রয়েছে। তাই ওপরের অলিখিত নির্দেশ, হাজার অপরাধেও এখন কোনও গোষ্ঠীকেই চটানো যাবে না। শাস্তি বিধান নিয়ে পরে ভাবা যাবে, বাড়াবাড়ি হলে তাই যুযুধান দু'পক্ষকে এক সঙ্গে ধর্নামঞ্চে বসিয়ে দিয়ে আপাত সামাল দেওয়ার নিদান দিচ্ছে কন্ট্রোল রুম। কিন্তু এতে যে তোলাবাজরা মেনে নিয়ে হাত গুটিয়ে 'কর্মবিরতি' ঘোষণা করবে সেরকম ভাববার কোনও সুযোগ আছে কি?

কাজেই শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করার সুকঠিন সিদ্ধান্ত বা দায়িত্ব নেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। ছাত্র-যুব সংগঠনকে চাঙ্গা না রাখলে রাজনৈতিক দল চালানো কোনওকালেই সম্ভব ছিল না। বেকারি কর্মহীনতার যুগে রাজনীতিকেই 'জীবিকা' করার পথ কোনও নেতা যে তাঁর তরুণ অনুগামীদের দেখাবেন সেটাই স্বাভাবিক। দুর্বৃত্তায়নের চাপে শিক্ষা যে পলায়নের রাস্তা খুঁজে নিয়েছে অনেক আগেই তার প্রমাণ আদর্শ শিক্ষক-রাজনীতিবিদদের

পুত্র-কন্যাদের ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলা, যার অনুকরণ আজ সংক্রমণে পরিণত হয়েছে। এর সূচনাকালের সন্ধান মিললেও শেষ কোথায় তা বলতে পারেন না কেউই। বহুদিন আগের এক দেওয়াল লিখন আজকাল বড় ভাবায়— 'হায় তুই উল্টা বুঝলি রাম! লাল ভন্ডে লন্ডভন্ড, বাংলার বিধি বাম'।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

নোট বাতিলের ছায়া আদৌ পড়ল কি ডুয়ার্সের মেলা-উৎসবে?

ফের ডুয়ার্স সফর। পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি অসুরের কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনও ভাষা নেই। আপনার প্রিয়তম ভূখণ্ডে যদি নানা অজুহাতে বারবার যাওয়ার বা ঘুরে দেখার সুযোগ পান, আর কয়েক পাতা হিজিবিজি লিখে দিলেই যদি পরের সফর নিশ্চিত হয়, তবে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কী-ই বা জানানো যায়! তার ওপর শীতকালীন মেলা উৎসব যদি সেই সফরের উদ্দেশ্য হয় তবে তা যে প্রতিবেশীকে ঈর্ষান্বিত করার পক্ষে যথেষ্ট সেকথা সহজেই অনুমেয়। কারণ পর্যটকের সাধারণ চোখে গরমের বা পুজোর ছুটির চাইতেও শীতের কুয়াশাজড়ানো মোহময়ী ডুয়ার্স অনেক বেশি উপভোগ্য। পর্যটন বিশেষজ্ঞ না হয়েও তাই প্রেসক্রিপশন লিখতে পারি, ডুয়ার্সে একাধিকবার বেড়াতে এলেও একটিবার আসুন স্রেফ শীতের ডুয়ার্সের মেলা ও উৎসবের আমেজ নিতে। তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্লেষণ করুন, মোদি-ফতোয়ায় 'বিপর্যস্ত' ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষ এবারের মেলা-উৎসবে কতটা কম বা বেশি যোগ দিতে পেরেছে।

> নোটের প্রাথমিক আকাল, পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ, লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। অথচ সেই কঠিনতম সময়ে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম মেলা চত্বরের দেখেছি, মেলায় বেড়াতে আসা তরুণ-তরুণীর ফুর্তিতে ভাটা নেই, দল বেঁধে গ্রামীণ পরিবার মেলা ঘুরছেন মহা উৎসাহে, মা-মাসিমারা কেনাকাটা করছেন ধীরেসুস্থে, রয়েসয়ে।

সেই কোচবিহার রাসমেলা থেকে শুরু। সে সময় নোটের প্রাথমিক আকাল, পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ, লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। গ্রামে, শহরে সর্বত্র দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রায় অবরুদ্ধ। অথচ সেই কঠিনতম সময়ে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম মেলা চত্বরের ভিড়ে হারিয়ে যেতে যেতে দেখেছি, মেলায় বেড়াতে আসা তরুণ-তরুণীর ফুর্তিতে ভাটা নেই, দল বেঁধে গ্রামীণ পরিবার মেলা ঘুরছেন মহা উৎসাহে, মা-মাসিমারা কেনাকাটা করছেন ধীরেসুস্থে, রয়েসয়ে। নতুন ও পুরনো নোট দুই-ই চলছে তখন, মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ রসেবশেই কাটিয়েছে ক্রেতা ও বিক্রেতা। দুইয়ের বোঝাপড়ার মিল যে অসাধ্য সাধন করতে পারে তার প্রমাণ চোখের সামনে

'এখন ডুয়ার্স'-এর স্টলে গুণীজনদের সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী

'এখন ডুয়ার্স'-এর কোচবিহার' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর স্টলে সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়

মিলেছে কোচবিহার রাসমেলায়।

শিলিগুড়ি বইমেলায় বিমুদ্রাকরণের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। কোনও রকমে স্টলের খরচা তুলে মানে মানে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়েছে অংশগ্রহণকারীরা। জানা গেছে, বেশ কিছু বড়সড় প্রকাশক শেষপর্যন্ত আসেইনি মেলায়। উত্তরবঙ্গ বইমেলায় এহেন করুণ পরিস্থিতি গত পাঁচ-ছয় বছরে চোখে পড়েনি। বই বাণিজ্যে বা বই পড়ায় উত্তরের অন্যান্য জেলাগুলি থেকে পিছিয়ে থাকে এই উপমহানগর, তবু এবার যেন একেবারেই ব্যতিক্রম। যদিও শহরে বইমেলার আগে হয়ে যাওয়া খাদ্যমেলায় ('খাইবারপাস') উপচে পড়া ভিড় ও তার সঙ্গে বিক্রিবাটার বহর দেখলে সত্যিই সব হিসেব গুলিয়ে যাওয়ার মতো হয়েছিল।

সে যাই হোক শিলিগুড়ির পরেই ছিল জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা। গতবারের মতো ভিড় বা বিক্রি হয়নি ঠিক কথা। তবু বইপত্র বিক্রির বহর দেখে বোঝা গেল, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, যা আশার কথা। এরপর বড়দিন-নববর্ষের ছুটি পেরিয়েই শুরু হল কোচবিহার জেলা বইমেলা, আয়তনে, স্টল সংখ্যায়, বাণিজ্যে অন্যান্য বইমেলার চাইতে অনেকটাই বড়। কিন্তু প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত এই বইমেলার দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। বিক্রিও এবার কোথাও কম, কোথাও বেশি। তবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর স্টল জলপাইগুড়ির পর কোচবিহার বইমেলায় যথেষ্ট আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল কোনও সন্দেহ নেই। বইমেলার তৃতীয় দিনে প্রকাশিত হয়েছিল 'কোচবিহার' নামের বইটি। আগাগোড়া ছবিতে মোড়া আজকের কোচবিহারের সার্বিক ধারণা পেতে পারে পাঠক। বলাই বাহুল্য, এই বইয়ের রেকর্ড বিক্রি বইমেলায় বাকি সবাইকে পিছনে ফেলে দেয়। পত্রিকার প্রতিনিধিদের কথায় উচ্ছ্বাস, এতটা সাড়া পাওয়া যাবে ভাবিনি কেউই, বিশেষ করে নোট বাতিলের জমানায়। সত্যি কথা বলতে নগদের অভাব তেমন অনুভব করাই গেল না এবার।

একই ছবি ডুয়ার্স উৎসবেও। আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঠে দশদিন ব্যাপী ১৩তম 'ডুয়ার্স উৎসব'-এ মানুষ দলে দলে দশ টাকা মাথাপিছু টিকিট কেটে মেলা প্রাঙ্গণে যে হারে ঢুকেছে ঘুরে বেড়িয়েছে, কোথাও মনে হয়নি যে বিমুদ্রাকরণের কোনও প্রভাব পড়েছে। ভিড় ছিল 'এখন ডুয়ার্স'-এর স্টলেও। বিবিধ পণ্যের মেলা হলেও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা এবং প্রকাশিত বইপত্র উল্টেপাল্টে দেখা এবং কেনাকাটায় বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল মানুষদের মধ্যে। বিক্রি কোচবিহার বইমেলাকে টপকাতে না পারলেও, আলিপুরদুয়ারেও যে বহু বইপ্রেমী ডুয়ার্সপ্রেমী মানুষ রয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে এবার। শুধু বা বইয়ের কথাই বলি কেন, নতুন মেলার স্বীকৃতি পাওয়ার পরথেকে প্রত্যেক বছরই এই মেলার আয়োজনে নিষ্ঠা রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। প্রত্যেক সন্ধ্যায় মূল মঞ্চে বিখ্যাত সব গায়কদের অনুষ্ঠানে প্যারেড গ্রাউন্ড শেষ কয়েকদিন যেন ডুয়ার্সের মহা উৎসবে রূপান্তরিত করেছিল। এখন বারবার চোখে আঙুল দিয়ে যেন প্রমাণ করছিল, নোট বাতিলকে ডুয়ার্সের উৎসবমুখর জনগণ বোধহয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই দেখিয়েছে।

উত্তরায়ণ সমাজদার

বাগিচা শ্রম আইন চুলোয়, সরকার কি এখনও জেগেই ঘুমাবে?

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় এই চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **অষ্টম পর্ব**।

নতুন বছর। ২০১৭ সাল। পুরনোকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আবাহন। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন উদ্যম, নতুন প্রচেষ্টা, নতুন ভাবনা পুরনোর মোড়কে। পুরনোর আবর্জনা পরিষ্কার করে স্বচ্ছতা। স্বচ্ছ ভাবনাচিন্তা, স্বচ্ছ সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি। সর্বোপরি স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা। স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা আসা প্রয়োজন ডুয়ার্সের এবং তরাইয়ের চা-বাগিচার শ্রমিকদের রুজি-রোজগারের প্রশ্নে, স্বচ্ছতা আসা প্রয়োজন সরকার-মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, স্বচ্ছতা আসা প্রয়োজন তরাই-ডুয়ার্স তথা উত্তরের উন্নয়নের স্বার্থে।

মাঝেমধ্যে অবাক লাগে এটা ভাবতে যে, সত্যি সত্যি আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি? নইলে যে শোষণের ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল, গ্রামবাংলা শ্মশানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল; ডুয়ার্সের বহু বন্ধ বাগানে তো একই প্রতিচ্ছবি। শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল কি সবটাই ভগবানের হাতে? কোনও চা-বাগান বন্ধ হলেই রাজ্য সরকারের তরফে শ্রমিকদের দু'টাকা কেজি দরে চাল এবং তিন টাকা কেজি দরে গম দেওয়া হয়। তিন মাসের মধ্যেই ফাউলাই-এর টাকা দেওয়া। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, চা-বাগিচার মালিকরা ছ'মাসের অধিক সময় ধরে বাগান পরিচালনার কাজে যুক্ত না থাকলে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার ১৯৫৩ সালের কেন্দ্রীয় চা আইনের ১৬খ, ১৬গ, ১৬ঘ ধারা অনুযায়ী চা-বাগানগুলি সরাসরি অধিগ্রহণ করছে না কেন?

বিশ্ব বাজারে চায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিনে কেন শিল্পসংকটের হাঁক দিচ্ছে মালিক-ব্রোকার আঁতাঁত? ভারতে চায়ের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চা-পানের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, চাহিদা বাড়ছে চায়ের। চা-পানের চাহিদা ভারতীয়দের পাশাপাশি সারা পৃথিবীব্যাপী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারে এসেছে ইনস্ট্যান্ট টি, লেমন বা নিম্বু টি, ফ্রোজেন টি। চা গাছ থেকে পাতা চয়ন করে ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন

করা সামগ্রী এখন আর চা নয়, চায়ের অবাধ গতি এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ অভিমুখে। চা এখন বিশ্বজনীন, ব্যাপক জনপ্রিয় পানীয়, যা বিদেশের মাটিতে অন্যান্য পানীয়ের সঙ্গে তুমুল প্রতিযোগিতা গড়ে তুলে ধীরে ধীরে নিজের জায়গাকে কায়েম করছে।

স্যার ওয়াল্টার ডানকান এবং গুডরিক ছিল আসাম, ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের চা শিল্প স্থাপনের অন্যতম পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে ডানকান এবং গুডরিক পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পৃথক হয়ে দু'টি পৃথক কোম্পানি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান স্থাপনের সময় সরকারি ঘোষণা ছিল, এই বাগিচা জমির মালিকানা সরকারের। এই জমি বিক্রি করা যাবে না। ডুয়ার্সের জমি যেহেতু ভুটানের সম্পত্তি ছিল, তাই ১৮৬৪-৬৫ সালে ভুটানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের শর্ত অনুসারে এই জমি ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে। তাই এখনকার জমির বিলিবণ্টন নতুন করে রাখতে হয়। তাহলে স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনায় এত গলদ কেন?

এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে এক বিপরীতধর্মী চিত্র পেয়েছি ক্ষেত্রসমীক্ষায়। ডুয়ার্স এলাকার ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি, মাল, চালসা, বানারহাট, বীরপাড়া ইত্যাদি শহর বা গঞ্জগুলি গড়ে উঠেছিল চা-বাগিচাকে কেন্দ্র করেই। সেই যুগে চা চাষের সূত্রেই শ্রমিক আমদানি করতে হয়েছিল, বন কেটে গড়তে হয়েছিল বসত। ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল নতুন মাটিতে দেশান্তরিত মানুষের নতুন সমাজ। তবে ব্রিটিশ অধিকারের আগে থেকেই এখানে সংকর বাঙালি এবং মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর কোচ, মেচ, রাভা, গারো, টোটো, ধিমাল, থারু, ভুটিয়া, লেপচা পাহাড়িয়া জনজাতির লোক মিলেমিশে বসবাস করত। চা চাষ প্রবর্তনের প্রথম যুগে এদের মধ্যে থেকে চা শ্রমিক নিয়োগ করা হত। উঁচু পাহাড় এলাকার চা-বাগানগুলিতে নেপালি ও পাহাড়িয়া শ্রমিকদের দিয়ে ভালই কাজ হত। কিন্তু সমতলে নেমে এলেই তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে যেত। একই অবস্থা লক্ষ করা যায় এখনকার চা-বাগিচাগুলিতে। অপুষ্টি, দারিদ্র নিয়ে শ্রমিকরা সকলেই প্রায় ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী।

বিগত বছরের ১৭ জানুয়ারি রাজ্য আইনি পরিষেবা সমিতির উদ্যোগে দার্জিলিঙের পানিঘাটা চা-বাগানে বসা লোক আদালতটি সংঘটিত হয়েছিল হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরের উদ্যোগে। তিন বাগান মিলিয়ে এ পর্যন্ত হওয়া মোট চারটি লোক আদালতেই ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। 'দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড ফোরাম' ২০১৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে চা-বাগিচা ইস্যুতে কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, চা-বাগিচাগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পরিষেবা অত্যন্ত জরুরি। যেসব অচল, বন্ধ চা-বাগিচা শ্রমিক পেটের দায়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে, তাদেরকে ফেরাতে যাতে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নেয়, সেই ব্যাপারেও আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। টি বোর্ড বাগানগুলির প্রতি নজর দিলেও পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেই কাজটি ঠিকমতো হচ্ছে না বলেও ডিভিশন বেঞ্চকে জানিয়েছে লিগাল এইড ফোরাম। পানিঘাটা, রেডব্যাঙ্ক, ডানকান্স-এর বাগরাকোট বাগানে বসবে বলেই আগে থেকে ঠিক ছিল। বন্ধ ও অচল বাগিচা শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি, বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা, ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর, গীতাঞ্জলি প্রকল্পসহ আরও নানা প্রকার সরকারি পরিষেবার অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি করার কথা বলা হয়।

২০১৫-র ১৭ মার্চ উত্তরবঙ্গের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যায় চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে গঠিত পরামর্শদাতা কমিটির প্রথম বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধিরা রাজ্যের কাছে একটি খসড়া প্রস্তাব চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তা শ্রমিক এবং মালিকদের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানোও হয়। ওই প্রস্তাবে একজন শ্রমিককে উপার্জনকারী হিসেবে ধরে একটি পরিবারের মোট তিনজন সদস্য মিলিয়ে ন্যূনতম মজুরি স্থির করার মানদণ্ড হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যপিছু দৈনিক ২,৭০০ ক্যালোরি খাদ্য, বার্ষিক পরিবারপিছু ৭২ গজ কাপড়, মোট ন্যূনতম মজুরির ৫ শতাংশ গৃহভাতা, ২০ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ জ্বালানি ভাতা মিলিয়ে ন্যূনতম মজুরি ১৫৮ টাকার

কথা বলা হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিরা আপত্তি জানিয়ে বলেন, আইন মোতাবেক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ অর্থ শ্রমিকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক খাতের জন্য যুক্ত হবে। এ ছাড়াও এতে যোগ হবে অন্যান্য আরও নানা মৌলিক চাহিদা খাতে ২০ শতাংশ অর্থ। যে মানদণ্ডে একটি পরিবারের হিসেব কষা হচ্ছে, সেটিও ঠিক নয় বলে জানানা হয়। বলা হয়, খাদ্য, বস্ত্র বা বাসস্থান খাতে ধরা টাকার অঙ্কও আইন মোতাবেক যুগোপযোগী নয়। ন্যূনতম মজুরি পরামর্শদাতা কমিটির শ্রমিকপক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি জিয়াউল আলম জানান, 'একদিকে চরম সরকারি উদাসীনতা এবং অন্য দিকে মালিকপক্ষের বিরোধিতা— এই দুইয়ের নিট ফল ব্যর্থ বৈঠক। জিয়াউল আলম, মণিকুমার দার্নাল, তেজকুমার টোপ্পো, মনোহর তিরকি প্রমুখ শ্রমিকনেতারা জানান, সরকার ১৫৮ টাকার যে খসড়া প্রস্তাব দিয়েছিল তা ন্যূনতম মজুরি আইন বিরোধী এবং পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকারও বিরোধী। কারণ, ওই প্রস্তাবে অনেক খাতেই টাকা ধরা হয়নি। শ্রম দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি গোপালকৃষ্ণ, শ্রম কমিশনার জাভেদ আখতাররাও কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি।

চা-বাগানের মালিকরা কিন্তু ভাল করেই জানে, মহিলা শ্রমিকরা পাতা তোলার কাজে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় অনেক দক্ষ। চা-বাগানের সুনাম এবং চায়ের গুণমান অনেকটাই নির্ভর করে পাতা তোলার কাজের উপর। তবু চা-বাগিচার মালিকরা নারী শ্রমিকদের পুরুষদের তুলনায় যে কম বেতন দিত, তার পক্ষে যুক্তি ছিল, একজন পুরুষ শ্রমিক একজন নারী শ্রমিকের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রমী। কিন্তু বাস্তবে চা-পাতা তোলার পাশাপাশি নারী শ্রমিকরা ঘরগৃহস্থালির কাজে জল তোলে, কাঠ কাটে, রান্না করে, বাসন মাজে, সন্তান ধারণ এবং তাদের প্রতিপালন করে বাগানের কাজ করার পর। নারী ও পুরুষের এই পারস্পরিক শ্রমদানের ফলে সামাজিক উৎপাদন হয় বলে বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

বাজারে তিন প্রকার চা ব্যবহার করা হয়— সিটিসি, অর্থোডক্স এবং গ্রিন টি। তিন প্রকার চায়ের মধ্যেই রয়েছে নানা প্রকার উপকারী উপাদান। গ্রিন টি-র ব্যাকটেরিয়াল এনজাইমটি একাধিক ওষুধ উৎপাদনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। গ্রিন টি হাইপারটেনশনের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা চা-পানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। চায়ের ভেষজ গুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি চায়ের ব্যবহারও কিন্তু দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। তাই চা শিল্প সংকটে যাঁরা বলছেন, তাঁরা সত্যের অপলাপ করছেন। বরং সারা পৃথিবী জুড়ে চায়ের

> গোপালকৃষ্ণ গান্ধি রাজ্যপাল থাকাকালীন রামঝোরা চা-বাগানে এসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধ চা-বাগিচার সমস্যা নিরসনে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতার দিকগুলি। তৎকালীন মন্ত্রী মনোহর তিরকি উপস্থিত ছিলেন। চা-বাগিচার শ্রমিক আবাসে গোপালকৃষ্ণ গান্ধি দেখেছিলেন, আবাসের উপর কোনও আচ্ছাদন নেই, পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব, চিকিৎসাব্যবস্থার করুণ হাল।

চাহিদা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে প্রতিযোগিতায় চা শিল্পের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক এবং যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে কিন্তু ভারতের চা সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী উত্তরের চা-বলয়। উত্তরের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। সবুজ গালিচা পাতা রয়েছে প্রতিটি চা-বাগানেই। কর্মব্যস্ত জীবনের ক্রিজে বিচরণ করার আগে আমরা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নিত্যদিনের কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণের দিকে অগ্রসর হই। চা-বলয়বেষ্টিত আসাম রাজ্য তথা দেশের সংগীতজগতের অহংকার ভূপেন হাজারিকা গানের মাধ্যমে সেই বার্তা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। চা-বলয়ের শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন পাঁচালির দিকে দৃষ্টি দিলে অনেক বঞ্চনার কথাই উঠে আসবে। চা-বাগিচা মালিকদের একটি বৃহৎ অংশ দায়িত্ব পালন না করার ফলে উত্তরের চা-বাগিচাগুলি বঞ্চনারই আঁতুড়ঘর। উত্তরের চা-বাগিচা শ্রমিক কর্মচারীরা বাগিচা শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্য পরিষেবা পাবার দাবিতে মাঝেমধ্যেই সরব হন, কিন্তু তা-ও ঘুম ভাঙে না মালিকপক্ষের। শ্রম দান করবেন, অথচ শ্রমের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না চা শ্রমিক কর্মচারীরা। চা-বাগিচার শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে আরও বেশি করে পাশে দাঁড়াতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠা হলেই জীবনসংগ্রামের শক্ত ক্রিজে দাঁড়াতে পারবে বধূয়া সাহানি, সোমরা ভগত, এতোয়া ওঁরাওরা।

১৯৫১ সালে বাগিচা শ্রম আইন চালু হয়েছে। ২০১৭ সালের দোরগোড়ায় এসেও বাগিচা শ্রম আইনের কথা বলতে হচ্ছে। বাম-শাসনে চা-বাগিচা শ্রমিক-কর্মচারীরা যেমন বাগিচা শ্রম আইন অনুসারে পরিষেবা যথার্থভাবে পায়নি, তেমনি মা-মাটি-মানুষের সরকারের দ্বিতীয় দফার শাসনকালে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। উত্তরবঙ্গের প্রয়াত বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা চিত্ত দে লিখিত আকারে মা-মাটি-মানুষের সরকারের শ্রম মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর কাছে অভিযোগ করেন, উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে আইনের শাসন নেই। ৯৫ শতাংশ বাগিচার মালিকপক্ষ বাগিচা শ্রম আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন। চিত্তবাবুর বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে, চা-বাগানের পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক নয়।

গোপালকৃষ্ণ গান্ধি রাজ্যপাল থাকাকালীন রামঝোরা চা-বাগানে এসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধ চা-বাগিচার সমস্যা নিরসনে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতার দিকগুলি। রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির সঙ্গে তৎকালীন মন্ত্রী মনোহর তিরকি উপস্থিত ছিলেন রামঝোরা বাগানে। আমি তখন সফরসঙ্গী প্রেস ক্লাবের একজন প্রতিনিধি হিসেবে। চা-বাগিচার শ্রমিক আবাসে গোপালকৃষ্ণ গান্ধি দেখেছিলেন, আবাসের উপর কোনও আচ্ছাদন নেই, পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব, চিকিৎসাব্যবস্থার করুণ হাল। রাজ্যপালের সফরের পর বাম-সরকারের মন্ত্রী এবং তৎকালীন প্রশাসনিক রথী-মহারথীরা নড়েচড়ে বসেছিলেন। শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের যৌথ মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা চিত্ত দে তাই যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন, ৯৫ শতাংশ বাগানে বাগিচা শ্রম আইন অনুসারে পরিষেবা পাচ্ছেন না চা শ্রমিকরা। মা-মাটি-মানুষের বর্তমান সরকারের আমলেও সবুজ গালিচার চা-ক্ষেত্রে গেলে দেখা যাবে, হাসপাতালগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তার নেই। ফার্মাসিস্টবাবুরা ওষুধের নামে কার্যত লাল আর নীল জল নিয়ে বসে আছেন। জরুরি পরিষেবা দেবার দায়িত্ব চা মালিকদের। অপুষ্টি দানা বেঁধেছে ঢেকলাপাড়া চা-বাগানে। বহু চা-বাগানেই রয়েছে অপুষ্টি। বাগিচা শ্রমিকদের পানীয় জল সংগ্রহ করতে যেতে হচ্ছে ঝোরাতে। চা-বাগানের কর্মচারীরা পানীয় জল কিনতে বাধ্য হন। এটা কার লজ্জা? বলবেন কি সরকার বা মালিকপক্ষ? পান থেকে চুন খসলে মালিকরা শ্রমিক-কর্মচারীদের শো-কজ করেন, চাকরি থেকে কর্মচ্যুত করেন। নিয়মবিধি ভাঙলে শো-কজ করেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এটাই নিয়ম। বছরের পর বছর বিধি ভাঙছেন মালিকপক্ষ। তাঁদের শো-কজ করবে কোন সরকার? ঘুম ভাঙাবে কবে? সরকারের ঘুম ভাঙাবে কে? এটাই প্রশ্ন লাখো লাখো শ্রমিকের।

মেঘ ছুঁয়ে যায় মণ্ডলগাঁও

সকালে উঠেই দেখি মেঘে ঢাকা আকাশ। এদিকে যে ছুটি শেষ হয়ে এল। উদয়দা ফোনে বলল, বৃষ্টি আসছে যে। বার তো হই।— আমি বললাম।

উদয়দা আমার সহকর্মী-বন্ধু। কথা হচ্ছিল, একদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব ডুয়ার্সের দিকে। কোথায় যাওয়া যায়? ঠিক হল ডুয়ার্সের সুইটজারল্যান্ড। নামটি উদয়দারই দেওয়া। জায়গাটি হল মণ্ডলগাঁও। আপার চালসা, মেটেলি পার করে সুনতালিখোলার পাশে। অর্থাৎ সামসিং পার করে যেতে হয়। এই সামসিং থেকে দার্জিলিং জেলা শুরু হয়ে যায়, অথচ জলপাইগুড়ি শহরের কত কাছে।

স্নান-খাওয়া সেরে দশটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। জলপাইগুড়িতে উদয়দাকে সঙ্গে নিয়ে বেরতে বেরতে এগারোটা বেজে গেল। এদিকে আকাশ ক্রমে ঘন কালো হয়ে আসছে। ৩১ডি জাতীয় সড়ক দিয়ে স্কুটি ছুটিয়ে চললাম আমরা। নেমে এল বৃষ্টি। খানিকক্ষণ দাঁড়াবার পরে বৃষ্টি কমে এল, কিন্তু দু'জনের ভুরুই কুঁচকে গেল। কারণ, এদিকেই যদি এরকম বৃষ্টি নামে তো ডুয়ার্সের পাহাড়ে তো নির্ঘাত বৃষ্টি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। বেশি না ভেবে বৃষ্টি কমতেই ঝটপট রওনা দিলাম। বাতাবাড়ি পেরিয়ে লাটাগুড়ি— গোরুমারা জাতীয় উদ্যান। পথের দু'ধারে সুপ্রাচীন গাছ অরণ্য আজন্ম পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর অরণ্যের ভিতর হরিণ, ময়ূর, সাপ, বাইসন, হাতি, প্রজাপতি, ব্যাং, পাখি, ঝিঁঝিপোকা তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে দিনের পর দিন। এখানে মানুষের প্রবেশ অবাধ নয়, বরং অবাঞ্ছিত। আমরা তবু অতিথি হয়ে তাদের সংসারে উঁকিঝুঁকি মেরে আহ্লাদিত হই, উচ্ছ্বসিত হই, তারা হয় না।

লাটাগুড়ি পেরিয়ে চালসা, তারপর আপার চালসা। পাহাড় শুরু হয়ে গেল। মেটেলির রাস্তার দু'পাশে চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। গুডরিক কোম্পানির আইভিল টি এস্টেট চোখে পড়ে। এর পরেই সামসিং। পাহাড় আর পাহাড়ি নিসর্গে ঘেরা চারপাশ। ক্রমশ উপরে উঠছি আমরা। ঝিঁঝিপোকা আর স্তব্ধতায় এক ঘোর লাগা পরিবেশ। সরু রাস্তা দিয়ে দু'-একজন করে

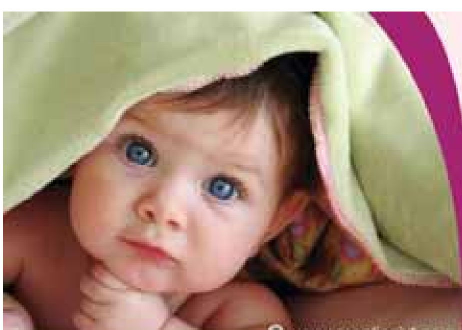
বন্ধ্যাত্ব
জনিত সমস্যার সর্বরকম সমাধান
CREATION
খুশী যখন আপনার ঘরে করবে প্রবেশ
সেই মূহূর্তের স্বপ্নপূরণের সাথী
আন্তর্জাতিক মানের IVF (টেস্ট টিউব বেবি) সেন্টার এখন শিলিগুড়িতে
www.creationivf.com
+91-95641 70008 / +91-95641 50004
creationthefertilitycentre@gmail.com
Sony Centre, Basement Floor, Opp. Rishi Bhawan
Burdwan Road, Siliguri, Pin-734005

উপরে উঠে আসছে। উঠে আসছে আমার কবিতার মীনা রাই, বাজার বোঝাই টুকরি মাথায় নিয়ে।

একটা রাস্তা চলে গেল সুনতালিখোলা, মৌচুকির দিকে। আরেকটি পাহাড়ের উপরে মণ্ডলগাঁওয়ে। পাহাড়ে সবুজের চাদর বিছিয়ে রেখেছে কেউ। রাস্তার গা ঘেঁষে ছোট ছোট বাড়ি, কিছু পাকা আর কিছু কাঠের। বাড়িগুলির শোভা বৃদ্ধি করছে অসংখ্য ফুলগাছ। আজ বাজার বসছে মণ্ডলগাঁওয়ে। ছোট বাজার। জুতা, সবজি, খাবার ইত্যাদির দোকানে পুরুষ-মহিলারা বাজার করছে।

মণ্ডলগাঁওয়ের একেবারে উপরে শেষ প্রান্তে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালাম আমরা। নেমেই দেখলাম, মেঘপুঞ্জ পাহাড়ের মাথায় নেমে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। পাহাড় আর ঘন অরণ্য ঘেঁষে সাদা সাদা মেঘ। রাস্তার পাশে বড় বড় চিলাউনি গাছ। আসলে এগুলি বড় এলাচের গাছ। ছোট ছোট ধাপ কেটে আদা, ভুট্টা,

এলাচ চাষ করা হয়েছে। পরিচয় হল কমল রাইয়ের সঙ্গে। এখানকার সমাজকর্মী ও লজ মালিক। তিনিই জানালেন, ধীরে ধীরে ভ্রমণপিপাসু লোকেদের আনাগোনা বাড়ছে মণ্ডলগাঁওয়ে। মণ্ডলগাঁও কথাটি এসেছে ট্যাক্স কালেক্টর থেকে। ব্রিটিশ আমলে ট্যাক্স কালেক্টরের অফিস ছিল এখানে। সেই থেকেই এই গ্রামের নাম মণ্ডলগাঁও বা মণ্ডলগ্রাম। জনবসতি বরাবরই ছিল। জনজাতির মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি হল চাষবাস। এলাচ, আদা, ভুট্টা, ফুলঝাড়ু ইত্যাদি উৎপাদন হয়। মহিলারাই বেশি কর্মঠ। প্রতি সপ্তাহে এরা এসব নিয়ে চালসা, মালবাজার, শিলিগুড়িতে বিক্রি করে আসে। আবার ফেরার পথে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে ফেরে। এভাবেই এদের জীবন বয়ে চলেছে। বেশির ভাগ বাড়িতেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। রাস্তা সরু হলেও পাকা। বেশ কিছু হোমস্টে গজিয়ে উঠেছে দেখলাম।

ঘুরেই আসুন না একবার, জলপাইগুড়ি শহর থেকে মাত্র ৭০ কিমি দূরে পাহাড়ের কোলে এক অপরূপ শান্ত গ্রাম মণ্ডলগাঁওয়ে। যোগাযোগঃ ০৩৫৬২-২১৬২০০, ২০০৩২৪।

অমিত দে

ছবি: উদয় শঙ্কর সরকার

দেবপ্রসাদ রায়

২৪

দলের কাজে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে লেখক লক্ষ করেছেন যে, সবখানেই অন্তত একজন দলীয় ‘পাগল’ থাকে, যে কোনও কিছুর প্রত্যাশা না করেই প্রবল ভালবাসে দলের পতাকা আর সংগঠনকে। আবার রাজনীতি করতে গিয়েই রামচন্দ্র রথের মতো প্রতিভাবান কিন্তু আলস্যপ্রিয় সভাপতিকেও দেখেছেন। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্র আসলে বিচিত্র মানবজীবনের সুবৃহৎ মেলা। সময় ১৯৮০। ইন্দিরাজি আবার ফিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে। এর কিছুদিন পর ভেঙে পড়ল সঞ্জয় গান্ধির বিমান।

জাতীয় যুব কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনজন সভাপতির সঙ্গে মোট সাত বছর কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল। রামচন্দ্র রথ, গুলাম নবি আজাদ এবং তারিক আনোয়ার। আগেই বলেছি, রথকে কেন জোর করে সভাপতি করা হয়েছিল। সঞ্জয়জির অনুগামীদের ভিতর ’৭৭ সালে একমাত্র ও-ই লোকসভা ভোটে জিতে এসেছিল। এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিল রথ। জ্ঞানের গভীরতায়, ভাষার উপর দখলে ওর পাশাপাশি কেউ ছিল বলে কখনও মনে হয়নি। কিন্তু অলসতায় তুলনাহীন, চরিত্রে লাগামহীন এবং সব কিছুকে অকপটে মেনে নেবার সাহস আমার দীর্ঘ দিল্লি-জীবনে আর কারও ভিতর দেখেনি। আবার ওর আলস্যের জন্যই আমরা যারা পদাধিকারী ছিলাম— কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কোনও কর্মসূচি নিয়ে কেউ এসে রথকে যদি বলত, আমরা আয়োজন করেছি, আপনাকে আসতে হবে। ওর অকাট্য যুক্তি হত, ‘দেখো, আমি তো সাংসদ হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই যে আমার সাধারণ সম্পাদকরা, এরা তো একেবারে আনকোরা। এদের যদি না নিয়ে যাও, তাহলে এরা পরিচিত হবে কী করে?’

আমাদের ভিতর পানিক্করের ইনিশিয়েটিভ ছিল সবচেয়ে বেশি। ও নিজেই চেষ্টা করত কোনও না কোনও অবকাশ খুঁজে নিজেদের মেলে ধরবার। খবর এল, মিরাটে দাঙ্গা হয়েছে। পানিক্কর বলল, চলো ঘুরে আসি। আমি, পানিক্কর, গুলাম নবি আজাদ ও বিনোদ শর্মা— আমরা চললাম মিরাট জেলার দাঙ্গাগ্রস্ত গ্রাম বরোধ এলাকায়। আমাদের যাওয়ার কোনও সংবাদ কাউকে দেওয়া ছিল না। ফলে হারা উদ্দেশে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু হল না। জানা গেল, শহরে কংগ্রেস দলের বিধান পরিষদের সদস্য মঞ্জুর আহমেদ থাকেন। তাঁর বাড়ি খুঁজে বার করে তাঁর সঙ্গে দেখা করা হল। তিনি নিজেও দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় গিয়েছেন বলে মনে হল না। কারণ, বিষয়টাকে লঘু করে বললেন, এরকম ছোটখাটো গ্রাম্য বিবাদ হয়েই থাকে। এতে আপনাদের এত দূর থেকে আসবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও এ কাহিনি লিখছি। কারণ, ওখান থেকে দিল্লি ছাড়বার আগে পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে যত জায়গায় গিয়েছি, একটা করে ‘পাগল’ পেয়েছি, যে কংগ্রেসে বিলীন হয়ে আছে না-চাওয়া, না-পাওয়া, না কোনও হিসেব। কেবল ঝান্ডা আর দল— যেন এর জন্যেই জন্মেছে, আর এর জন্যেই বেঁচে থাকা। মিরাটের ছেলেটি আবার বোবা। মঞ্জুর সাহেবের বাড়িতেই দেখলাম। আমাদের দেখে তার যেমন একদিকে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অন্য দিকে সে একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে কিছু দেখাবার চেষ্টা করল।

এমএলসি সাহেব বললেন, মোরারজি যে পেচ্ছাব খায়, সেটা ও ব্যঙ্গ করে বোঝাতে চাইছে।

রথ শুধু আমাদের কাজ করবার সুযোগ করে দেয়নি, ওর বর্ষাতিতে থাকবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। পানিক্কর আর গুলাম নবি আজাদ স্থায়ীভাবে থাকত, আর আমি রাত হয়ে গেলে আজমিরি গেটে না গিয়ে ওদের সঙ্গে শুয়ে থাকতাম।

মজার ব্যাপার হল, এই দিনগুলিতেই কখনও দেরাদুন অভিযান, কখনও জনপথে লড়াই ও গ্রেপ্তার বরণ— কোনওটাতেই কিন্তু পানিক্কর, রথ বা গুলাম নবি কেউ যুক্ত হয়নি। ঘটনাচক্রে এই ঘটনাবহুল সময়গুলোতে ওরা দিল্লির বাইরেই থেকেছে। আমাদের ভিতর গুলাম নবির সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ ছিল, ও মুসলিম এবং কাশ্মীরের ছেলে। তাই ইন্দিরাজির নজরে আসতে সময় লাগল না। '৮০ সালের লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রের 'ওয়াসিম' কেন্দ্র থেকে ওকে জিতিয়ে আনলেন।

৩০ মাস পরে ফিরে আসার তৃপ্তি যখন পুরো দলের একটা খুশির হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে, তখন অসময়ে বজ্রপাতের মতো, ২৩ জুন সঞ্জয়জির বিমান দুর্ঘটনার খবর এল। আমরা সবাই হতচকিত হয়ে ১ নং সফদরজং রোডের দিকে ছুটলাম। উল্কার বেগে ভারতের রাজনীতির আকাশে এসেছিলেন— উল্কার বেগেই পতন হল।

জেলের ভিতর এক সঞ্জয়জিকে চেনবার সুযোগ হয়েছিল— ১ মে '৭১ থেকে ৫ মে '৭৯— তার কাহিনি আগেই শুনিয়েছি। ক্ষমতায় আসবার পর আস্তে আস্তে ওঁর অগ্রাধিকার বুঝতে পারছিলাম। রাজনীতির গভীরতা নয়, পথের লড়াইকেই উনি বেশি প্রাসঙ্গিক মনে করতেন। ফলে আমরা যেমন ওঁর কাছে আস্তে আস্তে গুরুত্ব হারাচ্ছিলাম, লড়াইয়ে (!) পারদর্শী বলে ওঁর কাছে সোমেনদার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছিল। ফলে সঞ্জয়জির অসময়ে মৃত্যুতে এ রাজ্যে সোমেনদাই সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তবে রথের বিশেষ আস্থাভাজন হওয়ার ফলে রথ যতদিন সর্বভারতীয় সভাপতি ছিল, ততদিন সোমেনদা যুব কংগ্রেসকে নিজের ইচ্ছেমতো চালাতে পেরেছে।

দিল্লিতে আমরা তখন আজমিরি গেটে থাকি। আমি স্থায়ীভাবে, আর সোমেনদা, বীরেনদারা আসা-যাওয়া করেন। একবার ওঁদের সঙ্গে একজন সাংবাদিক এলেন। নামটা ভাল করে মনে নেই, শ্রমিক সংগঠন এনএলসিসি-র পরামর্শদাতা সুনীল করের ছোট ভাই। ইংরেজি সাপ্তাহিকে ছিলেন। তখন এখনকার মতো বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছিল

সঞ্জয়জির অকালমৃত্যুতে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে এল, এবার কে? ইতিমধ্যেই কিছু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। দিল্লি যুব কংগ্রেস, জগদীশ টাইটলারের নেতৃত্বে সঞ্জয়জির নিজস্ব বাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল। এবং মানেকা গান্ধিও মনে করতেন, দিল্লির রাজ্য যুব শাখা আনুগত্যের প্রশ্নে তাঁর সঙ্গেই আছে। তাঁর পরামর্শে দিল্লি যুব কংগ্রেসের একটা বড় অংশ 'সঞ্জয় বিচার মঞ্চ' গঠন করে মানেকাকে সক্রিয় রাজনীতিতে আনা হোক, বলে একটা চাপ সৃষ্টি করবার জন্য উদ্যোগী হয়ে সঞ্জয়জির সমাধিস্থলে প্রতীকী অনশনের কর্মসূচি গ্রহণ করল।

না, প্রচারের জন্য প্রিন্ট মিডিয়াই ছিল একমাত্র মাধ্যম। আর আমরা যারা পাদপ্রদীপের আলোয় আসার চেষ্টা করছি, কোনও না কোনও অজুহাতে একটা করে প্রেস রিলিজ পাঠিয়ে দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, পরের দিন কেউ ছেপেছে কি না দেখবার জন্য।

মৃণাল কর (সম্ভবত এই নামই ছিল ওঁর)-সহ সোমেনদারাও যখন আজমিরি গেটে, তখন আবার নতুন করে আসামে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন শুরু হয়েছে। তখনও রাজ্যে সুব্রতদা ছাত্র পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'বঙ্গাল খেদা'র প্রতিক্রিয়ায় সুব্রতদা হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, অবিলম্বে এই নির্যাতন বন্ধ না হলে আমরা অর্থনৈতিক অবরোধ করব। শিলিগুড়ি থেকে কোনও ট্রাক আসাম যাবে না। মৃণালবাবু বললেন, মিঠুবাবু, 'আপনি সর্বভারতীয় পদে আছেন। আপনি কেন আবেদন করছেন না, সুব্রতবাবু যাতে এই প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ না নেন।' আমি জানতাম, সুব্রতদা আমার আবেদন হয়ত পড়বেও না, কিন্তু কাগজে নাম তোলার একটা সুযোগ যখন এনে দিচ্ছে, তখন লিখেই ফেলি। লিখলাম ও পাঠালাম। প্রতিলিপি দিল্লির কাগজগুলোতেও পাঠালাম। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' প্রথম পাতায় বার করল।

কাকতালীয়ভাবে সেই দিনই লোকসভায় বিরোধীরা যখন ইন্দিরাজিকে চেপে ধরে যে, আপনার পশ্চিমবাংলার ছাত্র শাখা তো অবরোধের ডাক দিয়ে আরও উত্তেজনা বাড়াচ্ছে, ইন্দিরাজি তখন আমার চিঠির কথা উল্লেখ করতে বলেন, এটা যাতে না ঘটে, দল তার জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে। বরুণ সেনগুপ্ত তখন খুবই বড় সাংবাদিক। বিকেলে এআইসিসি-তে এসে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন, আমি চিঠি কোনও নেতার নির্দেশে লিখেছিলাম কি না। আমিও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে রহস্য করে বললাম, 'কেউ না বললে কি আমি এমনি এমনি লিখছি?'

সঞ্জয়জির অকালমৃত্যুতে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে এল, এবার কে? ইতিমধ্যেই কিছু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। দিল্লি যুব কংগ্রেস, জগদীশ টাইটলারের নেতৃত্বে সঞ্জয়জির নিজস্ব বাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল। এবং মানেকা গান্ধিও মনে করতেন, দিল্লির রাজ্য যুব শাখা আনুগত্যের প্রশ্নে তাঁর সঙ্গেই আছে। তাঁর পরামর্শে দিল্লি যুব কংগ্রেসের একটা বড় অংশ 'সঞ্জয় বিচার মঞ্চ' গঠন করে মানেকাকে সক্রিয় রাজনীতিতে আনা হোক, বলে একটা চাপ সৃষ্টি করবার জন্য উদ্যোগী হয়ে সঞ্জয়জির সমাধিস্থলে প্রতীকী অনশনের কর্মসূচি গ্রহণ করল।

আমরা বুঝতে পারছিলাম না, কী হতে চলেছে। রথ তখনও যুব সভাপতি। একদিন রথই বলল, 'চলো, আমরা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্যরা ইন্দিরাজিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কে আসছে— মানেকা, রাজীব গান্ধি?'

ম্যাডামের সময় নেওয়া হল। রথ দলবল নিয়ে গিয়ে ১ আকবর রোডে হাজির। ইন্দিরাজি এলেন। রথ তার রোদচশমাটা খুলে ম্যাডামকে বলল, 'ইন্দিরাজি, আমরা বুঝতে পারছি না, এখন আপনি কাকে আনতে চাইছেন। মানেকা গান্ধি অথবা রাজীব গান্ধি? ফলে আমরা একটা বিভ্রান্তির মধ্যে আছি।'

ইন্দিরাজি যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'শোনো, এখন বেশ কিছুদিন আমার পরিবার থেকে কেউ রাজনীতিতে আসবে না।'

কে আসবে তা যদিও বোঝা গেল না, তবে রথ যে যাবে তা বেশ ভালভাবেই বোঝা গেল।

(ক্রমশ)

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-২। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

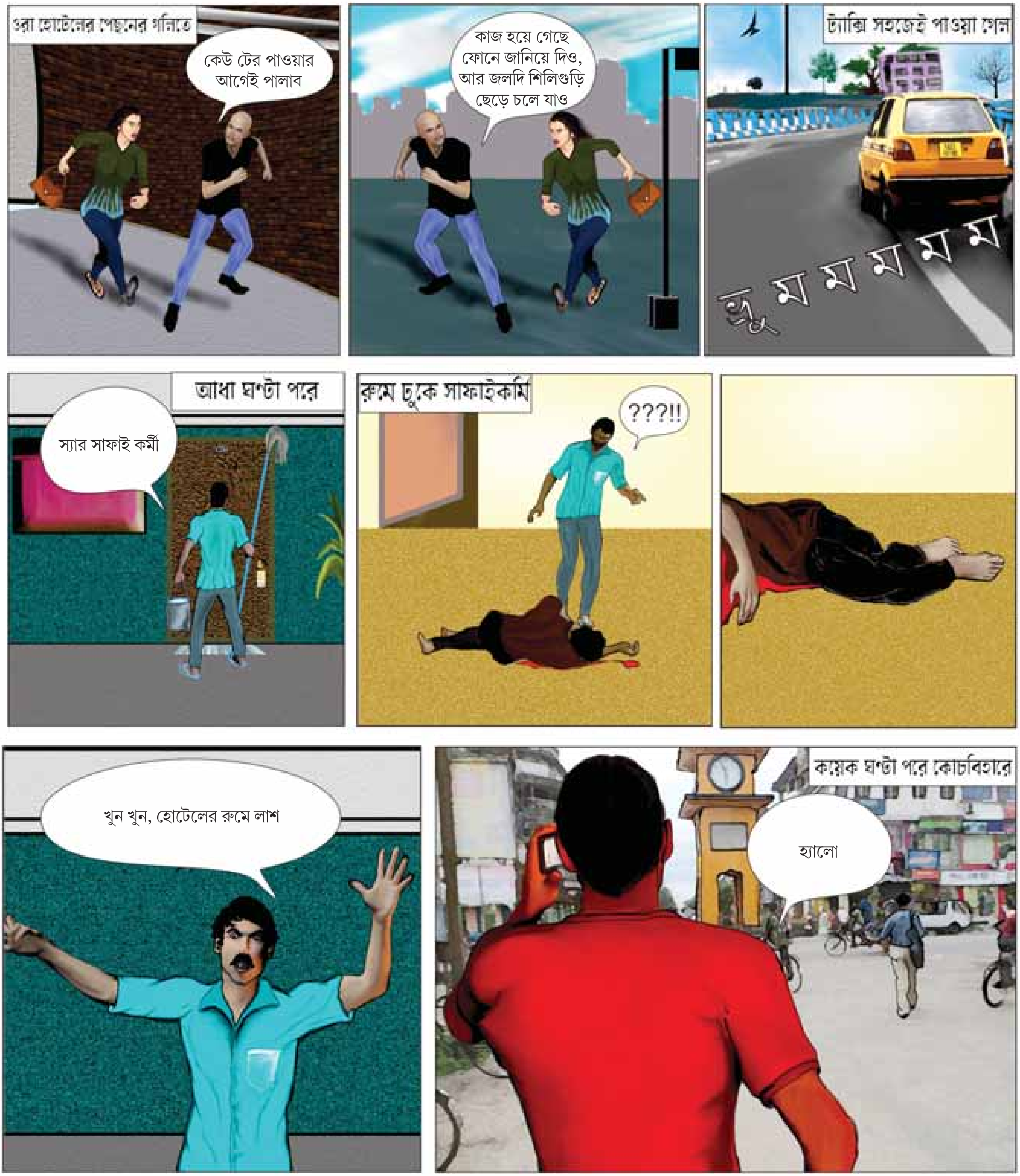

তরাই উৎরাই

৩৯

সন্ধে হয়ে আসছে। জেলা স্কুলের শিক্ষক রমেশ গুপ্তভায়া হিদারুর বাড়িতে তার বড় ছেলের সঙ্গে দেখা করে দ্রুতপায়ে হাঁটছিলেন গোপাল ঘোষের বাড়ির দিকে। তিন দিন হয়ে গেল, পুলিশ পিটিয়ে হিদারু নিরুদ্দেশ। পুলিশ তার কদমতলার বাড়িতে তো বটেই, রায়কতপাড়ার আসল বাড়িতে বারকয়েক হানা দিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টাউনের পাড়াগুলোকে কয়েকটা ব্লকে ভাগ করে প্রতি ব্লকে জেলা স্কুলের কোন কোন ছাত্র থাকে, তার একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকদের সপ্তাহে দু'দিন একটা করে ব্লকে টহল দিয়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়। লেখাপড়া নিয়ে ছাত্রদের কে কী সমস্যায় ভুগছে, সে খোঁজও নিতে হয়। রমেশ গুপ্তভায়া আজ কদমতলা লাগোয়া ব্লকে থার্ড ক্লাসের এক ছাত্রের সন্ধানে এসেছিলেন, কিন্তু এলাকার লোকজন তাঁকে ছেলেধরা বলে সন্দেহ করায় ফিরে আসতে হয়েছে। আসলে রমেশবাবু আগে ছিলেন বারাসাতে। বছরকয়েক হল জলপাইগুড়ি এসেছেন। টাউনে এখনও জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে তাঁর পরিচিতি গড়ে ওঠেনি।

হিদারুর বড় ছেলে জেলা স্কুলের ছাত্র না হলেও তার সঙ্গে দেখা করাটা রমেশবাবু নিজের কর্তব্য বলেই মনে করেছিলেন। চারদিকের যা পরিস্থিতি, তাতে পুলিশ পিটিয়ে ফেরার হলে বাড়িতে ফিরে আসার আশু কোনও সম্ভাবনা নেই। রমেশবাবু জেনেছেন যে, হিদারুর বড় ছেলেটা পড়াশোনায় ভাল। কোনও ছাত্র পড়শুশোনায় ভাল শুনলে রমেশবাবু স্থির থাকতে পারেন না। হিদারুর কীর্তিটা জানার পর তাঁর মনে হয়েছে, ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে সাহস দিয়ে আসবেন। দরকার হলে পড়াশোনার ব্যাপারে তাকে সাহায্যও করবেন। কিন্তু হিদারুর বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে বাড়ি ফাঁকা। বাড়ির সামনে একটা মস্ত চেহারার পুলিশ পাহারায় আছে। পড়শিদের কাছে খবর পেলেন যে, হিদারুর মা আর বউ তাদের মূল বাড়িতে চলে গিয়েছে, এবং তার বড় ছেলে পড়াশোনার সুবিধের জন্য উঠেছে গোপাল ঘোষের বাড়িতে।

গোপাল ঘোষের সঙ্গে রমেশ গুপ্তভায়ার আলাপ হয়েছিল। টাউনের কয়েকজন ভাল ছাত্র মিলে একটা সায়েন্স ক্লাব খুলেছিল। তাদের দরকার ছিল একটা মাইক্রোস্কোপের। সে যন্ত্র কেনার জন্য তিনি ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছিলেন গোপাল ঘোষের বাড়ি চাঁদার উদ্দেশ্যে। মানুষটিকে বেশ পছন্দ হয়েছিল রমেশবাবুর। পরম উৎসাহে সে দিন সবাইকে আপ্যায়ন করার পাশাপাশি কলকাতা থেকে ভাল যন্ত্র আনিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষাও করেছিলেন। তবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে কে বা কারা সেই সায়েন্স ক্লাবে আগুন লাগিয়ে দেয়। নষ্ট হয়ে যায় মাইক্রোস্কোপটি। এই ঘটনায় চোখে জল এসেছিল রমেশবাবুর। তিনি শুনেছেন যে, স্বদেশি আন্দোলনের কালে একবার জেলা স্কুলটাও পুড়িয়ে দিয়েছিল কেউ। কেরোসিন ভরা বোতলের মুখে পাটের গুচ্ছ এঁটে তাতে আগুন দেওয়া হয়েছিল, যাতে বাইরে থেকে আগেই বোঝা না যায় যে, আগুন লেগেছে। যখন বোঝা গেল, ততক্ষণে আর কিছুই করার ছিল না। আন্দোলনের নামে স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া তিনি সহ্য করতে পারেন না।

সারাদিন প্যাচপেচে গরমের পর বিকেল নাগাদ তিস্তার হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। গোপাল ঘোষ তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে একজোড়া নতুন ক্রেপসোল ক্যাম্বিসের জুতো নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। পুলিশ পেটানোর পর হিদারু খুদিদার বাড়িতে লুকিয়ে আছে। খবরটা ক্ষত্রিয় উন্নয়ন সমিতির তিন-চারজন সদস্য ছাড়া আর কেউ জানে না। হিদারুর পরিবারকেও জানানো হয়নি। তবে উপেন বর্মনের সঙ্গে দেখা করে গোপাল ঘোষ নিজেই জানিয়ে এসেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিদারুকে জলপাইগুড়ি থেকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় নামে বাবুপাড়ার এক যুবক চা-বাগানের ব্যবসায় নেমেছে। সে কয়েক দিনের মধ্যেই বাগান পরিদর্শনে যাবে। হিদারুকে তার সঙ্গে কোনও বাগানে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জলপাইগুড়ি থেকে হিদারুকে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের দলে ভিড়িয়ে দেওয়াটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। ভাল হয় তাকে আলাদাভাবে টাউন থেকে বার করে মাঝপথে সত্যেন্দ্রর দলে ভিড়িয়ে দেওয়া। অবশ্য সেটা কীভাবে সম্ভব, সে বিষয়ে এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারেননি গোপাল ঘোষ। খুদিদাও এ নিয়ে কোনও আশার কথা শোনাতে পারছেন না। কিন্তু হিদারুকে টাউন ছেড়ে চা-বাগানে লুকিয়ে থাকতে হলে কিছু জিনিসপত্রের যে দরকার হবে, সে বিষয়ে গোপাল ঘোষের কোনও সন্দেহ নেই। তিনি সেই দরকারি জিনিসগুলি কেনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ক্যাম্বিসের জুতোটা সেই উদ্দেশ্যেই কেনা।

গেট খুলে রমেশ গুপ্তভায়াকে আসতে দেখে গোপাল ঘোষ বেশ বিস্মিত হয়ে বৈঠকখানা থেকে জুতো হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এ কী! রমেশবাবু যে! আসুন আসুন!'

দ্রুত হেঁটে আসার কারণে রমেশবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। তাঁকে বৈঠকখানার আরামদায়ক চেয়ারে বসিয়ে গোপাল ঘোষ পাঙ্খাপুলারকে বললেন, 'জলদি পুল করো।'

'শুনলুম হিদারুবাবুর ছেলেটা নাকি আপনার এখানে আছে? ভাবলুম তার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। পড়াশোনায় তার নাকি বেশ মাথা?'

'আমি তাকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছি। সে পেনের কালি আনতে বাজারে গিয়েছে। এখুনি এসে পড়বে।' গোপাল ঘোষ এবার জুতোটা নামিয়ে রেখে বিনয়ের সুরে বললেন, 'ছেলেটা লেখাপড়ায় বেশ ভাল। অমৃতবাজার গড়গড় করে পড়তে পারে।'

'বাঃ!' রমেশবাবুর চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে— 'ইংরিজিতেই তো উত্তর লিখতে হবে ম্যাট্রিকে। তা ট্রান্সলেশন কেমন পারে সে? বঙ্কিমবাবুর বই থেকে প্যাসেজের পর প্যাসেজ ট্রান্সলেট করতে হবে বুঝলেন? স্টেটসম্যানের এডিটোরিয়াল পড়তে পারলে খুব ভাল হয়।'

'কিন্তু স্টেটসম্যান তো ন্যাশনালিস্ট না।'— গোপাল ঘোষ সংশয়ের সুরে বললেন। পাড়ার মোড়ে অতুল বক্সির বাড়িতে রোজ একখানা করে স্টেটসম্যান কেনা হয় পোড়ানোর জন্য। গোপাল ঘোষ নিজেও একদিন গোটা দশেক কাগজ কিনে আগুন লাগিয়ে শিশুর মতো মজা পেয়েছেন। কিন্তু রমেশবাবু এহেন যুক্তিতে রীতিমতো অসন্তুষ্ট হয়ে গোপাল ঘোষকে কিঞ্চিৎ ধমক দিয়ে বললেন, 'পড়াশোনার আবার ন্যাশনাল কী? ঠিকমতো ইংরিজি শিখতে যদি বড়লাটের স্পিচ পড়তে হয়, তা-ই পড়তে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অত বাছবিচার চলে না।'

গোপাল ঘোষ থতমত খেয়ে বললেন, 'তা বটে!'

আরও দু'কথার পর দেখা গেল, হিদারুর ছেলে বাজার থেকে ফিরে এসেছে। রমেশবাবু এবার তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটু পরেই বোঝ গেল যে, ছাত্র ও শিক্ষক দু'জনেই দু'জনকে পেয়ে ভারী খুশি, এবং তাদের আলোচনায় গোপাল ঘোষের কোনও স্থান নেই। তিনি দু'জনের জন্য উত্তম জলখাবারের ব্যবস্থা করার হুকুম দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গেটের সামনে দাঁড়ালেন। এরই মধ্যে কখন যে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে আর মিহি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তা ভিতরে বসে বোঝা যায়নি। গোপাল ঘোষ দেখলেন, তাঁর বাড়ির অদূরে কেউ একজন ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। অমনি তাঁর মনে হল, হিদারুর জন্য একটা ছাতা কেনার দরকার ছিল। কাজটা তখুনি সেরে ফেলার জন্য তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন ঘোড়ার গাড়ির আশায়। তখনই ছাতা মাথায় লোকটা এগিয়ে এল।

'কিছু বলবেন?'— গোপাল ঘোষ লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার বাড়িতে ঢুকতাম। কিন্তু লোক এসেছে দেখে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।' এদিক-সেদিক তাকিয়ে জবাব দিল লোকটা। ধুতি-চাদর পরা মাঝারি চেহারার লোকটাকে দেখে দেশি মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল। গোপাল ঘোষ একটু অবাক হয়ে বললেন, 'আমার কাছে এসেছেন নাকি আপনি? কী দরকার বলুন তো?'

'হিদারুকে কবে টাউনের বাইরে নিয়ে যাবেন, সেটা ঠিক করে আমাকে জানাবেন। কোথায় নিয়ে যেতে হবে, সেটাও বলে দেবেন। বাকি দায়িত্ব আমাদের।'

গোপাল ঘোষ আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের মানে? আপনি কে?'

'আমাকে তারিণী বসুনিয়া পাঠিয়েছেন।'

'তারিণী বসুনিয়া?' গোপাল ঘোষের বিস্ময় আর ফুরাচ্ছে না, 'কোথায় তিনি?'

'সেটা বলা নিষেধ। তবে তিনি কোথায় আছেন, সেটা জানাটাও জরুরি নয়। আমি কাল আসব। এই সময়ে।'

'আপনি পুলিশের চর নন তো?' এবার সন্দেহ ফুটে ওঠে গোপাল ঘোষের কণ্ঠস্বরে, 'হিদারু কোথায় তা আমি কী জানি!'

'সে খুদিবাবুর বাড়িতে আছে। পুলিশ হলে ধরে আনতে যেতাম।' লোকটা মৃদু হেসে কথাটা শেষ করে দ্রুতপায়ে হেঁটে মিলিয়ে গেল পাড়ার কেরোসিন পথবাতি জ্বলা আলো-আঁধারি পথে। কাছেই কোথাও শেয়াল ডাকল একটা। তারপর সাড়া দিতে শুরু করল বাকিরা। মিহি কুয়াশার মতো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গোপাল ঘোষ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আগন্তুকের চলে যাওয়ার দিকে। একসময় তিনি দেখলেন, পাশ দিয়ে হিদারুর ছেলে একটা ছাতা নিয়ে বেরুচ্ছে। তিনি বাস্তবে ফিরে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস? রমেশবাবুকে জলখাবার দিয়েছে?'

'দেখি একটা স্টেটসম্যান পাই কি না।' খুব উত্তেজিত গলায় কথাটা বলে ছাতা খুলে প্রায় দৌড়াতে শুরু করল হিদারুর ছেলে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

অরণ্য মিত্র

৭০

দীননাথ চৌহানের মালিকের নতুন বাংলোতে অতিথি হয়ে এলেন দাসবাবু আর রঞ্জিত। হাফলং যাওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রেখে কেন তাঁরা সেখানে? অপহরণের চেষ্টার পর থেকে মনামি সাবধান হয়ে গিয়েছে। 'শকুন্তলা' ভিডিয়োর কাজ শুরু হওয়ার পথে। দেশি পর্ন ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা ড্রেস ডিজাইনার মণিকা এসেছে তাই শিলিগুড়িতে। কিন্তু দীপককে শরীরের ফাঁদে ফেলে তথ্য বার করে আনার কাজে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া সুষমা কি এবার ধরা পড়ে যাবে? টানটান উত্তেজনা এবারের পর্বে।

কিপটে মালিক টুরিস্টদের জন্য আলাদা করে একটা এক্সক্লুসিভ দু'কামরার বাড়ি বানিয়েছে ঠিকই, তবে ভাড়াটা বেজায় বেশি হয়ে গিয়েছে বলে দীননাথ চৌহানের ধারণা। দিনপ্রতি চার হাজার টাকা শুনে গত সাত দিনে একটাও বুকিং হয়নি। শীতকাল প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন ডুয়ার্সে গরম পড়তে শুরু করবে। টুরিস্টের আগমন অনেক কম এখন। মালিক বাজে সময়ে নতুন বাড়িটা উদ্‌বোধন করেছে। গোটা রিসর্টে এখন দু'জনের একটা পরিবার। গতকাল এসেছে। আজ গিয়েছে রিশপ বেড়াতে। ফলে দীননাথের কোনও কাজ নেই এখন। মালিকও গিয়েছে নাগরাকাটায়।

দীননাথ মাঝে মাঝে সেই স্যারের কথা ভাবে। অনেকদিন হল তাঁর কোনও ফোন নেই। তাঁর দিয়ে যাওয়া ছবি দুটোর মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছিল দীননাথ। সে হল একটা এনজিও-র দিদিমণি। এসটি মেয়েদের খোঁজখবর করতে ডুয়ার্সের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কাছেই একটা চা-বাগান বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। দিদিমণিদের গাড়ি মাঝে মাঝে আসে সেখানে। স্যারকে সেই মেয়ের খবরটা দেওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, পরের বার এসে মোটা বকশিস দেবেন। কিন্তু এখনও আসেননি। বকশিস বড় কথা নয়। স্যার যে দীননাথকে গুরুত্ব দিয়েছেন,,দীননাথের প্রতিভা বুঝতে পেরেছেন— এটাই বড় জিনিস।

সকাল থেকেই হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। এই সময়ে ফরেস্টে রকমারি অর্কিড ফোটে। চমৎকার সব রঙে সেজে থাকে গাছগুলো। মনটা কেমন খারাপ খারাপ হয়ে থাকে সারাক্ষণ। দীননাথের মনেও তেমন একটা খারাপ খারাপ ভাব ফড়িঙের মতো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। নতুন বাড়িটায় টুরিস্ট এলে তাঁর কিছু কমিশন থাকত। মালিকের উচিত ছিল এই সময়ে কিছুটা ছাড় দেওয়া। তবে সে নতুন বাড়িটা বানাতে আর সাজাতে খরচা খারাপ করেনি। বেডরুমের বিছানাটা তো দেখার মতো। মালিকের ধারণা, মেয়ে নিয়ে এসে এমন বিছানা পেলে টুরিস্ট নাকি আর অন্য কোথাও যাবে না। কিন্তু তবুও দীননাথ বলবে যে, ভাড়াটা বেশ ভারী হয়ে গিয়েছে।

একটা গাড়ি এসে থামল। ঘাড় ঘুরিয়ে দীননাথ দেখল, দু'জন লোক হেলতে-দুলতে রিসর্টের প্রবেশদ্বার পেরিয়ে পাথর বিছানো সরু রাস্তা দিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। চকিতে আলস্য আর মন খারাপ ঝেড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে দীননাথ বলল, 'গুড মর্নিং সার! রিসর্ট টু ওয়েলকাম!'

মালিক তাকে ইংরেজি কম বলার পরামর্শ দিয়েছিল বটে। কিন্তু লোক দুটো দীননাথের কথা বুঝতে পেরে হাসল। একজন বলল, 'ঘর ফাঁকা আছে তো?'

'ইয়েস সার! আপনারা ভেরি লাকি সার! আমাদের এই বাংলোটা খালি আছে। একদম নিউ। ফ্যান্টাস্টিক বেড সার। ইফ স্লিপ নাথিং গো এনিহোয়্যার।' দীননাথ বক্তব্য পেশ করে

ভারী আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করল যে, লোক দুটো নতুন বাড়িটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। 'আমরা দু'দিন থাকব। তিন দিনও হতে পারে। ভাড়া কত?'

'ফোর থাউজেন্ড পার ডে সার! ফ্রি ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড টি।' উত্তেজনায় একটু ঝুঁকে পড়ে জানায় দীননাথ। রেট শুনে লোক দুটোর মুখে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ওরা নিজেদের পকেট হাতড়ে দুটো কাগজ বার করে দীননাথের দিকে বাড়িয়ে দিল কেবল।

'হোয়াট দিস এগুলো সার?' দীননাথ একটু ঘাবড়ে গেল এবার।

'ভোটার কার্ডের ফোটোকপি। বাংলো বুক করতে গেলে পরিচয়পত্র লাগে না আপনাদের?' একজন উত্তর দিল, 'এগুলো নিয়ে খাতা বানিয়ে নিয়ে আসুন। সই করে টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ম্যানেজার তো?'

'সার্টেনলি সার!' দীননাথ ছোঁ মেরে নিয়ে নিল কাগজ দুটো। তারপর প্রায় দৌড়াল অফিস রুমের দিকে। তার দ্রুত হাঁটার ভঙ্গি দেখতে দেখতে দু'জনের মধ্যে যিনি দাসবাবু, তিনি বললেন, 'এই ছেলেটাই দীননাথ চৌহান। আমাদের অপোনেন্ট সম্ভবত একে দিয়ে কিছু ইনফর্মেশন কালেক্ট করেছে। দরকারে এখানে আমাদের কয়েকদিন কাটাতেও হতে পারে।'

'নো প্রবলেম!' চারদিক ভালমতো নিরীক্ষণ করতে করতে জানাল দ্বিতীয়জন। সে হল রঞ্জিত। দু'জনেই একটা বিশেষ তথ্য পাওয়ার পর হাফলং গমনের পরিকল্পনা ত্যাগ করে এসেছে দীননাথ চৌহানের খোঁজে। দীননাথ চৌহান তখন প্রবল উৎসাহে অতিথিদের নাম খাতায় লিখে মনে মনে নিজের কমিশন হিসেব করার চেষ্টা করছে। যদি তিন দিন থাকে, আর মালিক হাজার টাকা কমিশন না দেয়, তবে দীননাথ নিশ্চিত বিদ্রোহ করবে। দরকারে ম্যানেজারি ছেড়ে দেবে।

ওদিকে তখন রঞ্জিত চারপাশ দেখা শেষ করে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ভাল জায়গা। সামনে বন্ধ টি গার্ডেন। জায়গাটা আমরা ফিউচারে ইউজ করতে পারি।'

হু হু বাতাসে গাছ থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। সামনের জঙ্গল ধুলোর কুয়াশায় আবছা হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। খাতা নিয়ে ফিরে আসা দীননাথকে নিয়ে ওরা দু'জন ঢুকল বাংলোর ভিতরে। দীননাথের মুখে তখন কথার স্রোত ফুটেছে। কিন্তু দু'জন সে কথা বেশ মন দিয়েই শুনে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছিল টুকটাক তথ্য। একসময় রঞ্জিত বেশ প্রশংসার সুরে তাকে বলল, 'আপনি যে ভাল লোক, সে কথা আমাদের এক ফ্রেন্ড আমাদের বলেছে। একবার এসেছিল এখানে। চেনেন?'

'একজন সার এসেছিলেন!' দীননাথ সঙ্গে সঙ্গে চিনে যায়। 'আপনাদের ফ্রেন্ড নাকি? ভেরি গুড পার্সন। আমাকে রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে গেলেন। বাট সারের নামটা জানা হল না— এটাই আফশোস!' বলে দিল দীননাথ।

৭১

সে দিনের ঘটনার পর থেকে মনামিকে একা বাইরে বেরুতে নিষেধ করে দিয়েছেন সুরেশ কুমার। মনামি এখন বেশির ভাগ সময় ঘরেই কাটাচ্ছে। বাইরে গেলে তার সঙ্গে সুষমা থাকে। একটু দূর থেকে সুরেশ কুমারের লোক নজর রাখে তাদের উপর। ক্লায়েন্টকে সঙ্গ দেওয়ার কাজ এখন সুষমা একাই সামলাচ্ছে। আজ অবশ্য সকাল-সকাল সে আর সুষমা হাজির হয়েছে শিলিগুড়ির একটা বড় হোটেলের মিটিং রুমে। 'শকুন্তলা'র প্রোজেক্ট নিয়ে বেশ সিরিয়াস সুরেশ কুমার। ভাল ভাল প্রোডিউসার উৎসাহ দেখাচ্ছে ছবিটার ব্যাপারে। 'ঋষিকাম' ভিডিয়োটা প্রথম সারির পর্ন ক্রিটিকদের কাছে ভাল রেটিং পাওয়ার কারণে 'শকুন্তলা' নিয়ে বিদেশি প্রোডিউসারদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এইসব দেখে 'শকুন্তলা'র কাজ আরও জমিয়ে করার জন্য একজন স্পেশালিস্ট ড্রেস ডিজাইনারকে নিয়োগ করেছে সুরেশ কুমার। সেই মহিলার নাম মণিকা। সাম্প্রতিককালের বাজার কাঁপানো এক মালয়লম পর্ন ভিডিয়োর ড্রেস ডিজাইন করা মণিকা সেই ছবিতে বলিউডের ফ্লপ অভিনেত্রী গঙ্গা গোয়াঞ্জিকে এমন এক গামছার কাপড়ে তৈরি টু-পিস পরিয়েছিলেন, যার কোনও তুলনা হয় না। মিটিং-এ মণিকাও থাকবে আজ।

মনামি সেই মালয়লম পর্নটা দেখেছে। ফোর প্লে-র শটগুলোতে নায়িকার বিবস্ত্র থাকাটা পর্নশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অভিনব পোশাক থাকাটা জরুরি। এক বা দু'টানে সহজেই খুলে ফেলা যাবে এমন কোনও আবরণ। 'শকুন্তলা'র জন্য মনামিকে শরীর কিঞ্চিৎ ভারী করতে হয়েছে। এটা হওয়ার ফলে ইদানীং রাস্তায় বার হলে পুরুষরা আরও বেশি করে দেখতে শুরু করেছে তাকে। মণিকা প্রস্তাব দিয়েছে যে, মনামির জন্য সাদা সুতোর মশারির কাপড় আর স্টোভের ফিতে দিয়ে একটা বিশেষ পোশাক তৈরি করা হোক। সেটাই হবে চূড়ান্ত দৃশ্যের কস্টিউম। অবশ্য এর বাইরে আরও কস্টিউম থাকছে।

মনামি চাইলে এখন দেশের বাইরেও চলে যেতে পারে। সে রাজি হলেই সুরেশ কুমার তাকে জাপানে পাঠাবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। মনামির বাড়িতে চলে আসবে জাপানি ভাষা শেখার জন্য তার বৃত্তি পাওয়ার সংবাদ। মনামি তখন অফিশিয়ালি জাপানি ভাষা শিখতে দেশান্তরী হবে। জাপানি পর্ন ডিরেক্টরদের অনেকেই মনামিকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। কিন্তু মনামি নিজে জাপান যেতে রাজি নয়। সে যে শেষ পর্যন্ত পর্ন ফিল্মের আন্তর্জাতিক নায়িকা হবে— এটা তার মনের বাসনা নয়। সে কেবল একটা সময়কে কাজে লাগাচ্ছে। সুষমা মাঝে মাঝেই মনে করিয়ে দেয় যে, একবার এই জগতে চলে এলে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। টাকা আর উত্তেজনা এখানে এতটাই তীব্র যে, তার হাতছানি উপেক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। 'ভাবো একবার!' বলেছিল সুষমা। 'লক্ষ-কোটি পুরুষ তোমাকে স্ক্রিনে দেখে ফ্যান্টাসাইজ করছে। কী এক্সাইটিং মনামি! এ জিনিস আর কোথায় মিলবে ইয়ার?'

কথাটা সত্যি। যে নারী একবার শরীর আর মনকে আলাদা দুটো জিনিস বলে ভাবতে শিখেছে, সে মনকে নিষ্কলুষ রেখে শরীর নিলামে চড়াতে পারে। শরীর তখন তার কাছে ভয়ংকর এক অস্ত্র। তুড়ি মেরে পুরুষকে নিঃস্ব করে দেওয়া তার কাছে ছেলেখেলার মতো। এমন অস্ত্রকে ব্যবহার করার লোভ সামলে পথ বদল করাটা তাই খুব কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু অসম্ভব নয়। এই মুহূর্তে তার কাছে 'শকুন্তলা' একটা চ্যালেঞ্জ।

হোটেল এসে গেল। মিটিং রুমটা সত্যিই সুন্দর। সুরেশ কুমারের সঙ্গে লম্বামতো ফরসা মেয়েটাই যে মণিকা, সেটা মনামি অনুমানে বুঝে নিল। মণিকা তাকে হাঁ করে গিলছিল। সে গিয়ে চেয়ারে মণিকার মুখোমুখি বসতেই সুরেশ কুমারের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মণিকা বলল, 'জাস্ট অসাম! এই বারুদ ঠাসা শরীরটাকে তোমরা শিলিগুড়িতে রেখেছ কী করতে?'

''শকুন্তলা'র ফিউচার এখন কেমন দেখছ মণিকা?' সুরেশ কুমার হাসতে হাসতে বললেন, ''ঋষিকাম'কে জাস্ট মার্কেটে লঞ্চ করতে দাও। মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউয়ার স্রেফ পাগল হয়ে যাবে। তুমি যা-ই বলো, বেঙ্গলি গার্ল পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টারেস্ট নিয়ে আসতে শুরু করলে ওয়ার্ল্ডে ওরাই রাজ করবে। কিন্তু লুকিয়ে করতে হবে।'

'সেটা গোটা পৃথিবীতেই এক সমস্যা।' বললেন মণিকা, 'আমেরিকার মতো জায়গাতেও পর্ন অ্যাকট্রেসদের বাঁকা চোখে দেখা হয় সুরেশ! ছেলেরা অবশ্য সেখানে হিরো। স্ক্রিনের হিরো যদি তোমার হাজব্যান্ড বা বয়ফ্রেন্ড হয়, তবে ঠিক আছে। কিন্তু তা না হলে সাহেবরাও মেয়েদের ব্যাপারে একটু

নাক কোঁচকায়। রেপ পর্নের সাইটগুলো ফলো করে দেখো। টপ সেলিং ভিডিয়োগুলোর সব ক'টা মেল ডমিনেটেড। বিডিএসএম ক্যাটাগরিতে ক'টা ছেলে-টর্চারের নমুনা পাবে তুমি? তোমরা পুরুষরা সব জায়গাতেই ছড়ি ঘোরাও!'

জবাবে সুরেশ কুমার হা হা করে হাসল।

৭২

এই নিয়ে পঞ্চম দিন দীপকের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে মুনমুন। দীপক বেশ দ্রুত এগচ্ছে। এর মধ্যে মুনমুনের শরীরে হাত বোলানো, টেপাটিপি, চুমু খাওয়া ইত্যাদি কাজ সারা হয়ে গিয়েছে তার। এবার শোয়ার জন্য পাগল হয়েছে। আজ নির্ঘাত জামাকাপড় খুলতে চাইবে। মুনমুন ভালমতোই বুঝতে পারছে যে, দীপক এখন তার শরীরের মায়ায় সম্মোহিত হয়ে আছে। কিন্তু এখনই শরীর পুরো দিয়ে দেওয়া যাবে না তাকে। আজ তার প্রধান কাজ হবে ফ্ল্যাটটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা। এর জন্য সুরেশকে নিজের শরীরের নেশায় মাতিয়ে রাখা জরুরি। এই কারণে মুনমুন একটা চমৎকার ডিজাইনের ঘাগরা ধরনের পোশাকের সঙ্গে আঁটসাঁট টপ পরেছে রং মিলিয়ে। বুক দুটো অতি উত্তেজক দেখাচ্ছে। আজ দুপুরে যাওয়ার কথাটা সুরেশকে আগেই জানানো হয়েছে। শেষবার দেখা হওয়ার পর ইচ্ছে করেই কয়েকটা দিন দেখা দেয়নি মুনমুন। পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে অপেক্ষা করিয়েছে তার নতুন প্রেমিককে।

মুনমুন যেভাবে দীপকের প্রেমিকা হয়েছে, সেটা যথেষ্টই সন্দেহজনক মনে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দীপক বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। আসলে পুরুষ বলেই করেনি। তবে তার মালিক ক্যাভেন্ডিস সম্পর্কে সে বিশেষ কিছু জানে বলে মনে হয় না। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ক্যাভেন্ডিস একবারও আসেনি। এলে লোকটাকে চিনে নিতে হবে। তারপর খবর দিতে হবে জায়গামতো। সে লোকের আবার মেয়ে নিয়ে বিশেষ উৎসাহ নেই। সুতরাং সাবধানে এগতে হবে মুনমুনকে।

ফ্ল্যাটের দরজা দীপক খোলা রাখবে এমনই কথা ছিল। মুনমুন সেটা ঠেলতেই খুলে গেল। নিঃশব্দে ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মুনমুন এদিক-ওদিক তাকাল। সোফার উপর শুয়ে আছে দীপক। মুনমুন সেদিকে এগিয়ে গিয়ে শরীরে একটা হিল্লোল তুলে কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে গেল। পরক্ষণেই তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ। দীপক শুয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে নিষ্প্রাণ! হেলে যাওয়া মাথা আর বিস্ফারিত চোখ নিয়ে সে

ফ্ল্যাটের দরজা দীপক খোলা রাখবে এমনই কথা ছিল। মুনমুন সেটা ঠেলতেই খুলে গেল। নিঃশব্দে ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মুনমুন এদিক-ওদিক তাকাল। সোফার উপর শুয়ে আছে দীপক। মুনমুন সেদিকে এগিয়ে গিয়ে শরীরে একটা হিল্লোল তুলে কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে গেল। পরক্ষণেই তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ। দীপক শুয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে নিষ্প্রাণ!

তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। মুনমুন দৃশ্যটা দেখে মুখে হাত চাপা দিয়ে ছিটকে আসতে চাওয়া চিৎকারটাকে আটকাল। তখনই কে জানি পিছন থেকে বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম!'

মুনমুন চমকে পিছনে ঘুরতেই দেখতে পেল, একজন ব্যক্তি নিরাসক্ত মুখে একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'সো সেক্সি!' ব্যক্তিটি তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল। 'দীপক বেঁচে থাকলে বুক দুটো দেখে পাগল হয়ে যেত! বাট হি ইজ নো মোর। আর আমি এইরকম বুকে হাত দেওয়ার বদলে গুলি চালাতেই বেশি পছন্দ করব। সো ডোন্ট ট্রাই টু শাউট। তোমার বাঁচার সম্ভাবনা আছে।'

'আপনি কী চান?' মুনমুন শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল। 'আমি একজন কল গার্ল। পয়সা পাব বলে এসেছি। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'নাইস।' ব্যক্তিটি মাথা নাড়ল, 'তোমার সার্ভিস নেওয়ার মতো টাকা দীপকের ছিল নাকি? আজ তো প্রথমবার আসোনি ওর সঙ্গে মিট করতে। দীপক তোমাকে রোজ পে করত? ইন্টারেস্টিং! লিস্‌ন বেবি! আমার নাম ক্যাভেন্ডিস। তুমি দীপককে যেচে শরীর দিতে আসতে। তোমরা কেউ সিম্পল একটা জিনিস খেয়াল করোনি। এই রুমে একটা সিসি ক্যামেরা আছে। আমি আজ সকালে এসে সেটা চেক করে একটু অবাকই হয়েছি। দীপককে জেরা করে জানলাম তুমি তার প্রেমিকা। যেচে এসে ধরা দিয়েছ! মেয়ের নেশায় ছেলেদের লজিক গুলিয়ে যায় বলে দীপক সন্দেহ করেনি। কিন্তু তার অবস্থাটা তো দেখছ। এবার বলো সুরেশ কুমার কোথায়?'

'কে সুরেশ কুমার?'

'পাশের ঘরে অলরেডি আমার লোক এসে ভজন শুনছে খুকু!' হিসহিস করে বললেন ক্যাভেন্ডিস, 'সে-ও দীপকের মতো এমন ফিগার দেখলে পাগলা হয়ে যায়। ওই দেখো।'

মুনমুন দেখল একজন শক্তিশালী লোক ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিছু বোঝার আগেই সে মুনমুনের হাত দুটো চেপে ধরে পিঠের দিকে ভাঁজ করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে হাঁটুটা ঠেসে দিল ঘাগরার পিছনে। ক্যাভেন্ডিস ধীরপায়ে এগিয়ে এসে সাইলেন্সারের মাথাটা চেপে ধরলেন মুনমুনের বুকের ঠিক মাঝখানে।

'সুরেশ কুমার কোথায়?' খুব শান্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন ক্যাভেন্ডিস। মুনমুন চুপ করে থাকল। কয়েক সেকেন্ড মুনমুনের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাভেন্ডিস ইশারা করতেই হাত ধরে থাকা লোকটা মুনমুনকে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ক্যাভেন্ডিস ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসি-টা চালিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই রুমটা প্রায় সাউন্ডপ্রুফ। সো ইউ ক্যান ক্রাই আউট নাউ। এবার কি সুরেশ কুমারের খোঁজটা দেবে খুকু?'

'বলছি তো, আমি জাস্ট একজন কল গার্ল। দীপককে ফাঁদে ফেলে কিছু রোজগার করতে চেয়েছিলাম।' মুনমুন শান্ত থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু ক্যাভেন্ডিস হাসলেন। অপর লোকটা এবার মুনমুনের উপর ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে টপের গলাটা ধরে একটা টান মারতেই সেটা ফড়ফড় করে কাগজের মতো ছিঁড়ে গেল। মুনমুন আঁতকে উঠল লোকটার শক্তির পরিচয় পেয়ে।

'তোমাকে প্রাণে মারব না।' ক্যাভেন্ডিস একটা চেয়ারে বসলেন। 'দেখো একে কতক্ষণ সামলাতে পারো। তবে সুরেশ কুমারের পাত্তা বলে দিলেই তোমাকে ছেড়ে দেবে, অ্যান্ড তুমি আবার তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে পড়াশুনোয় মন দিতে পারবে।'

ক্যাভেন্ডিস চুপ করলেন। মুনমুনের কোমর থেকে ঘাগরাটা উড়ে গেল। কিন্তু সে কিছুতেই সুরেশ কুমারের খোঁজ জানাবে না। দেখা যাক ক্যাভেন্ডিসের এই শাগরেদের পৌরুষের জোর কতটা। পাঁপড় কারখানার মালিককে সামলানোর চাইতে বেশি কঠিন হবে কি?

(ক্রমশ)

গুলবাজ টেনিদা ছোটে খবরের আগে

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

সাগরিকা রায়

সংবাদপত্রে হরদম বিভিন্ন অপরাধের কথা শোনা যায়। সেই সঙ্গে থাকে পুলিশি মন্তব্য। সরাসরি পুলিশকর্তার অভিমতও পাওয়া যায়। পুলিশ শব্দটা এখন আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু সবসময় এরকম ছিল না। বিশেষ করে শাহরিক চেতনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত বলে ডুয়ার্সের মানুষের মধ্যে 'পুলিশ' শব্দটা অনেক দূরের গ্রহের প্রাণী বলে বিবেচিত হত। পুলিশের টুপি দূর থেকে দেখলে গ্রামকে গ্রাম ফাঁকা হয়ে যেত বলে শুনেছি। তবে সেই প্রাচীন ডুয়ার্সের গল্প নয় এখন। প্রাচীনত্ব থেকে একটু-আধটু মুক্ত হতে শুরু করেছে ডুয়ার্স। ইত্যবসরে বহিরাগতদের আগমন বেড়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। সর্বত্র একটু-আধটু অস্থিরতা বেড়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটেছে। কলকাতাতে মাঝে মাঝে বোমাবাজি হচ্ছে। 'মস্তান' শব্দটি চলছে রমরম করে। স্বদেশি যুগের বোমাবাজির সঙ্গে অবশ্য এই বোমাবাজির পার্থক্য আছে। বিদেশি তাড়াতে নয়, গৃহযুদ্ধের জন্য বোমা বানানো হচ্ছে। এই অবস্থায় ডুয়ার্সের শান্ত নিরুদ্‌বিগ্ন জীবনে কিছু বহিরাগতর আগমন ঘটে গেল। যারা চোঙা প্যান্ট পরত, শার্টের হাতা গুটিয়ে কনুইয়ের অনেক উপরে তোলা। পেট ভিতরে ঢুকিয়ে, ঘাড় একদিকে ঝুঁকিয়ে হাঁটত সেই যুবকরা। ঠোঁটের একপাশে অবজ্ঞার হাসি ঝুলে আছে, অন্য পাশে জ্বলন্ত সিগারেট! একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, তারা কখনও একা থাকত না। সবসময় দল বেঁধে থাকত। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সকলকে সচকিত করে যেত। প্রাচীনেরা আশঙ্কা করতেন, 'এরা' কিছু করে ফেলবে একদিন। ঘটলও তা-ই। এক রবিবারের হাটে কে বা কারা বোমা ফাটাল। শান্ত ডুয়ার্সে তীব্র আলোড়ন দেখা দিল। জনজীবন বিপর্যস্ত। দোকান-টোকান ফেলে দোকানিরা প্রাণ বাঁচাতে ছুটল। ক্রেতাদেরও একই দশা। তখন বোম শব্দটা অপ্রচলিত ছিল সাধারণ মানুষের জীবনে। যতটুকু ধারণা ছিল, সেটাও ভয়ংকর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী একটা ছড়া মুখে মুখে ফিরত— সা রে গা মা পা ধা নি/ বোম ফেলেছে জাপানি/ বোমের মধ্যে বাপ রে বাপ/ এত বড় কেউটে সাপ। কেউটে সাপকে ডুয়ার্সের মানুষ খুব ভাল করে চেনে। সুতরাং কী পরিমাণ হইচই হল বলাই বাহুল্য। চিৎকার, চেঁচামেচিতে ভরে গেল চারপাশ— 'ইহাঁ পর ভি বোম ফাটল ভাই, অব জায়েঙ্গে কহাঁ?' অপরাধের বাড়াবাড়ি না থাকায় পুলিশি তৎপরতার অভাব ছিল। অকুস্থলে যখন পুলিশ এল, তখন সব ভোঁ-ভাঁ। অপরাধের ধোঁয়া একটু-আধটু

আছে বটে, অপরাধীরা ভাগলবা। তবু ইত্যাকার কাজকম্ম কারা করতে পারে, তার আভাস ছিলই। চোঙা প্যান্ট-জামা-বাহারিদের তলব করা হল থানায়। প্রমাণাদি কিছু নেই। কেবল ধারণা আছে। সেই ধারণায় অবশ্য বাইসেপস-ট্রাইসেপস আছে। সম্ভাব্য অপরাধীরা সুড়সুড় করে থানায় হাজির হল। তাদের বলা হল, প্রতিদিনই একবার করে থানায় হাজিরা দিতে হবে। তারাও চুপচাপ নির্দেশ পালন করে চলল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে গেল স্থানীয় এক গুলবাজ 'টেনিদা'। মুখে বড় বড় বোল— বাঘ মেরেছি ক...ত! তো সে মস্তানদের উপদেশ দিল— বোমাটাতে মশলা কম ছিল বুঝলে? আগে জানলে বলে দিতাম।

—মানে? সব দিয়েছিলাম! জালিকাঠি, সুতলি, নিশাদল, বারুদ... তাহলে? সভ্যরা সবাই বিস্মিত।

—সেটা জানলে থানায় হাজিরা দিতে হত না। কী যে বুদ্ধি!

—আঃ! বলেই ফেল দেখি, কী দিতে হত?

—সামান্য ডিনামাইট। তা ছাড়া ব্যালিস্টাইট, করডাইট বারুদ দরকার ছিল।

—সেটা অ্যাটম হয়ে যেত। এক অতি বুদ্ধিমান সভ্য জ্ঞান প্রকাশ করে।

কিন্তু দিনের পর দিন ফাঁকা বুলি শুনে শুনে গরম মাথার যুবকরা কতক্ষণ মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে? তারা ঠান্ডা হল না ঠিকই, কিন্তু ঠান্ডা মাথায় একটা কাজ করে ফেলল। দু'জন কনস্টেবলকে হাত করল ঠিক নয়, বন্ধু করে ফেলল। নিজেদের দুঃখটা বোঝাতে পারল। বিশেষ কিছু নয়, টেনিদাকে একটু টাইট দিতে হবে। সে দিন টেনিদা এসে বসেছে। ঢোলা পাজামা, শার্ট, তেলে-জলে সাপটে রাখা চুল! পানের রসে জবজবে ঠোঁট।

রোগাপটকা শরীরটা নিয়ে সবে এসে বসেছে, কনস্টেবল দু'জন এসে দাঁড়াল দু'পাশে— আপনাকে থানায় যেতে হবে। খবর আছে, আপনি বোমা বানাবার পদ্ধতি জানেন। দু'পাশ দিয়ে দু'জন হাত চেপে ধরেছে, রোগা হালকা টেনিদা মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে ঝুলতে ঝুলতে, চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে— ছাড়ো ছাড়ো! বললেই কি আর ছাড়া হবে তাকে? কিন্তু রোগা শরীরটা বেঁকেচুরে পা ছুড়তে ছুড়তে ভীষণ ঝামেলা করছিল। ধরে রাখা দায় হয়ে পড়ল। আটাকলের সামনে আসতেই অদ্ভুত মোচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টেনিদা। তারপর... হাওয়া! পিছন ফিরে দেখবার কথা মাথায় আসেনি। তাই দেখত পেল না আসামি ভেগে যাওয়াতে তটস্থ হওয়ার বদলে পুলিশ কিনা হাসছে?

কিন্তু টেনিদা গেল কোথায়? নানান

রোগাপটকা শরীরটা নিয়ে সবে এসে বসেছে, কনস্টেবল দু'জন এসে দাঁড়াল দু'পাশে— আপনাকে থানায় যেতে হবে। খবর আছে, আপনি বোমা বানাবার পদ্ধতি জানেন। দু'পাশ দিয়ে দু'জন হাত চেপে ধরেছে, রোগা হালকা টেনিদা মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে ঝুলতে ঝুলতে, চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে— ছাড়ো ছাড়ো! বললেই কি আর ছাড়া হবে তাকে? কিন্তু রোগা শরীরটা বেঁকেচুরে পা ছুড়তে ছুড়তে ভীষণ ঝামেলা করছিল। ধরে রাখা দায় হয়ে পড়ল। আটাকলের সামনে আসতেই অদ্ভুত মোচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টেনিদা।

গলিঘুঁজি দিয়ে বাসায় পৌঁছাল টেনিদা। বউ রাঁধছিল। সোজা রান্নাঘরে ঢুকে— পিছনে পুলিশ লেগেছে। আমি গেলাম!

বউ হতবাক— গেলাম মানে? কোথায় গেলাম?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবে যে, সে কি আশপাশে আছে? চা-বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে থমকে দাঁড়াল। দূরে একটা মানুষ না? মুহূর্তে চা-বাগানের নালায় শুয়ে পড়ল টেনিদা। হাপরের শব্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। সন্ধে হতে ধানখেতের মধ্যে শুয়ে পড়ল। সারারাত কেটে গেল ধানখেতের মধ্যে। গভীর রাতে কয়েকটা শেয়াল এসে 'জিনিসটা' কী, শুঁকে দেখার চেষ্টা করল। শুয়ে থেকেই ফিসফিস ধমক দিল— গেলি? আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল কিছু ছুঁচো। হয়তো সাপও আছে। ঘুমের প্রশ্নই ছিল না। শেষ রাতে উঠে ফের হন্টন। পেটে কিছু পড়েনি। ক্লান্ত, বিপর্যস্ত টেনিদা এসে পৌঁছাল শিশুবাড়িতে। একটা পয়সা নেই পকেটে। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চোখ পড় প্রদীপের উপর। ওটা প্রদীপ? হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। টেনিদার চেনা লোক। রহস্য না ভেঙে যদি কিছু হেল্প মেলে! প্রদীপ টেনিদাকে দেখে অবাক— আপনি এখানে?

—ওই, একজনের কাছে কিছু টাকা পেতাম। তো সে আলিপুরদুয়ার গিয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না!

—বলছি, তোমার তো এখানে মেলা জমি। ওদিকে ব্যবসা, এদিকে জমিজিরেত... যদি মনে করো। আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি। কীভাবে? জমি দেখাশোনার লোক চাই কি না বলো? এত কাজ একা কি সামাল দেওয়া যায় রে? আমি থাকতে...?

প্রদীপ বুঝে ফেলেছে, আসলে টেনিদার একটা কাজ চাই।

—বেশ। প্রদীপ রাজি। দেখাশোনার লোক পেলে ভালই হয়। টেনিদা পরিচিত লোক।

বহাল হল টেনিদা। কাজ কিছু নেই। তবে আত্মগোপনের প্রয়োজন মিটল। সারাক্ষণ জমি পাহারা দেওয়ার কিছু নেই। ফসল ফলছে নিজের খুশিতে। নজর রাখতে হচ্ছে কেবল সেই কথাটায়— পিছনে পুলিশ! ঘুম নেই। খিদে নেই। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকতে থাকতে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা! এইরকম এক সঙিন মুহূর্তে হল কাণ্ড। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মনমেজাজ ভাল নেই। কে জানে প্রদীপের সঙ্গে পুলিশের দেখা হয়ে গেল কি না! মুখ ফসকে টেনিদার কথা বলে ফেলবে না তো প্রদীপ? তারপর, বউ কী করছে, কী খাচ্ছে! কোনও খবরও পাঠানো হয়নি তাকে। বিষণ্ণ টেনিদা একটু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল। সেই সামান্য সময়ের অন্যমনস্কতা অসামান্য হয়ে উঠল। ফসলভরা খেত। তার এপাশে টেনিদা। বুক অব্দি ঢেকে আছে ভুট্টা গাছ। কিন্তু খেতের ওপাশে ওটা? খাকি পোশাক! এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আসছে। সাইকেলে চেপে। এক নিমেষে ঘটনা বুঝে ফেলেছে টেনিদা। টেনিদার খবর আর গুপ্ত নেই। পুলিশ তদন্ত করতে চলে এসেছে। এবারে কী করবে টেনিদা? কথায় বলে, বায়ের আগে বার্তা ছোটে। এবার দেখা গেল, বার্তার আগে টেনিদা ছোটে। নদীনালা, মাঠঘাট... সব তুচ্ছ হয়ে গেল টেনিদার কাছে।

ভুট্টা গাছের আড়াল থেকে এক খণ্ড বিদ্যুৎকে দেখতে পেয়েছিল খাকি পোশাকধারী। মানুষ না চিতা, সেটা বুঝে উঠতে না উঠতেই সেটা মিশে গিয়েছে বাতাসে। এদিকে লোকজন দেখা যাচ্ছে না। প্রদীপ দত্তর নামে একখানা চিঠি আছে। সেটা দিতেই এসেছিল পিয়োন। খাকি পোশাক পরা পিয়োন। সাইকেল নিয়ে এগিয়ে গেল পিয়োন। আর টেনিদা? কীভাবে বউকে খবর দিয়েছিল বউকে কে জানে! দু'জনে সোজা শিলিগুড়ি।

পাটকাঠির আগুনে উষ্ণতার খোঁজে দুই হাত

'আরও শীত চুঁইয়ে পড়ুক গাছের পাতার তলায়/আরও শীত ছড়িয়ে যাক তোর কথা বলায়/আরও শীত বয়ে বেড়াক কমলালেবুর ঝুড়ি/আরও শীত চিনে ফেলুক দিনের আলোর চুরি।'

এই লেখার শুরুতে অনুপম রায়ের একটি গান কোট করা হয়েছে। সেই গান শুনতে শুনতে ফেলে আসা দিনের গন্ধ মাখা ডুয়ার্সের শীতের দিনগুলোতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। ডুয়ার্সের মাঘকে নাকি বাঘেও ভয় খেত। হি-হি ঠান্ডা হাড়ের একেবারে ভিতর পর্যন্ত গিয়ে সারা শরীরের রক্ত জমিয়ে দিত বরফের মতো। একটু গ্রামের দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যেত, রান্নাঘরে পাটকাঠি দিয়ে মাটির উনুনে রান্না হচ্ছে। সেই উনুন ঘিরে বসে কয়েকজন পাটকাঠির আগুনে হাত সেঁকছে। শহুরে রুমহিটার সেই পাটকাঠির উষ্ণতার কাছে তুচ্ছ।

ঠাকুমারা কাঁথা সেলাই করতেন। বারান্দায় পুরনো শাড়ি-কাপড়গুলি বিছিয়ে টানটান করা হত। পাড়গুলো থেকে সুতো বার করে নেওয়া হত। সুচে রঙিন সুতো ভরে সেলাই হত কাঁথা। সেই কাঁথা পেঁচিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে মাঝরাতে কানে আসত শেয়ালের ডাক। বাঁশের বেড়ার ফাঁকফোকর

দিয়ে হিম ঢুকত, আর ঢুকত কুয়াশা মাখা চাঁদের আলো। গেরস্ত বাড়ির উঠোনে থাকত খেজুর গাছের জট। গাছের গলায় কলসি বাঁধা। গাছি সে সকালবেলায় সেই রসের হাঁড়ি নামিয়ে দিত। অর্ধেক মালিকের, বাকিটা গাছির। ডুয়ার্সের হিম লেগে থাকা খেজুরের রস সকাল-সকাল যে না খেয়েছে, সে সেই অমৃতের আস্বাদ কল্পনাও করতে পারবে না।

ডুয়ার্সে শীতও পড়ত জাঁকিয়ে। একটু সম্পন্ন বাড়ির উঠোনে উঁকি দিলে দেখা যেত, ধানখেত থেকে সোনালিবরন ধান আসছে। উঠোনের এক কোণে সেই ধান ঝাড়া হচ্ছে, সেদ্ধ হচ্ছে। আশ্চর্য এক গন্ধে ম-ম করছে গোটা উঠোন। এসবের পরের পর্ব ছিল ধান শুকানো। ধান শুকিয়ে গেলে যত্ন করে রাখা হত এক কোণে। গোবরছড়া দিয়ে, লক্ষ্মী লক্ষ্মী বলে। কেননা ধান তো লক্ষ্মীই।

উঠোনের ওদিকটায় ঢেঁকিঘর। ঢেঁকিতে ধান কাটা হত। কুলোতে সেই ধান ঝাড়ত কয়েকজন মিলে। ধানের থেকে পাওয়া চাল আমাদের প্রধান খাদ্য, কিন্তু ধানের খোসাও কম উপযোগী নয়। তা লাগে জ্বালানির কাজে। চাল কুটতে গিয়ে কিছুটা ভেঙে যায়। তাকে বলে খুদ। খুদের ফেনাভাত এক আশ্চর্য খাবার। বাজারে চালের দোকানে বস্তায় সাজিয়ে রাখা চাল দেখে ভাবাই যায় না, তার পিছনে আছে এমন চমকপ্রদ কথা ও কাহিনি।

বিমুদ্রাকরণ ঘোষণার ঠিক পরদিন মানুষ যেমন প্রচুর ভেবে একটা একশো টাকার নোট প্রাণে ধরে খরচ করেছিল, ঠিক তেমনধারা স্বভাব পেয়েছে ডুয়ার্সের শীত। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো ডুয়ার্সেও শীত এখন কৃপণ হয়ে গিয়েছে। কলকাতার দিকে তো লেপ বার করার সুযোগ পাওয়া যায় না বহু বছর হল। গরম জামা ন্যাপথলিন চাপা হয়ে পড়ে থাকে মর্গে। ডুয়ার্সও সেদিকেই যাচ্ছে।

স্মৃতিজীবী মানুষ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। একটা সময় পড়ন্ত পৌষের ডুয়ার্স তার হিম মাখা

কুয়াশার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শুধু ভোরবেলা বা গোধূলির সময় নয়, সারাটা দিন ধরে সফেদবরন মিহিন কুয়াশা পরম আশ্লেষে গাছপালাকে আঁকড়ে পড়ে থাকত বহুদিন পর প্রেমিকার দেখা পাওয়া বিরহী প্রেমিকের মতো। তার সুখসঙ্গ ছাড়তে চাইত না কিছুতেই। দু'হাত দূরের লোককে চেনা যেত না। রহস্য জড়িয়ে থাকত ডুয়ার্সের জনপদে। সেসব সুখের দিন আর নেই। শীতবস্ত্র সেভাবে গায়ে না চাপিয়েই দিব্যি পার করে দেওয়া গেল এবারের পৌষ। এ যেন উষ্ণতার মোড়কে মোড়া অচেনা এক পৌষ। তার মেয়াদও শেষ হয়ে এল। এবার পালাবদল ঘটছে। শীতের ব্যাটন সে এবার তুলে দেবে মাঘের হাতে।

সে ছিল একটা সময়! সকালবেলায় কথা বললে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরত। রোদ্দুরের গন্ধ লেগে থাকত লালরঙা লেপের গায়ে। রাস্তার ধারের দোকানে কালো স্লেটে সাদা চক দিয়ে লেখা থাকত— গরম শিঙাড়া। ভিতরে ফুলকপির পুর। টোকা দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। বহু দূর থেকে শিঙাড়ার ঘ্রাণ নাকে এসে প্রাণ উদাস করে দিত। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ভাতের পাতে থাকত বিট-গাজরের ঝোল। টকটকে লাল রং। মা বলত, খেয়ে নে, ওতে রক্ত হয়। বিন বা ক্যাপসিকাম তখনও ডুয়ার্সের রসুইঘরে ঢোকেনি। দুরন্ত সব নিরামিষ পদ হত মধ্যবিত্ত বাড়িতে। মুলোরই তো কতরকম। মুলোর ডালনা, ছেঁচকি, ঘণ্ট। একটা আশ্চর্য সুখাদ্য ছিল মুলোর পাতুরি। মুলোকে সামান্য ডালের সঙ্গে বেটে কলাপাতায় মুড়ে চাটুতে সেঁকে তৈরি করা হত। পাতুরি হত শিমেরও। শিমের দানার ডাল, গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে শিম দানা। পালং শাকের কতরকম। বেগুন-কুমড়ো দিয়ে মুলোঘণ্ট তো ছিলই। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সৌজন্যে শীত তার পুরনো জৌলুস হারিয়েছে। সে এখন নির্বাসিত রাজা। তার রাজপাট আর নিজের দখলে নেই। রাজদণ্ড চুরি হয়ে গিয়েছে।

আটের দশকের শেষ, আমরা সে সময়ের স্কুলছাত্র, ডুয়ার্সে ফ্ল্যাট কালচার শুরু হয়নি তখনও। দোতলা বাড়ি শহরে তখন হাতে গোনা। বেশির ভাগই টিনের চালের একতলা ইংরেজি 'ইউ' শেপের বাড়ি। মাঝখানে বেশ খানিকটা উঠোন। উঠোন জুড়ে মরশুম ফুল। একদিকে হলদে গাঁদার বন। অন্য দিকে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আর পপি। উঠোনে আদ্যিকালের কালো হয়ে যাওয়া শিরীষ কাঠের চেয়ারে বসে থাকতেন বাড়ির অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ মানুষটি। ঝিমাতেন মাথা এলিয়ে দিয়ে। হাতে ধরা খবরের কাগজ খসে পড়ত অজান্তে। শীতের মিঠে রোদ্দুর শ্রীলক্ষ্মী হাত বুলিয়ে দিত বৃদ্ধ মানুষটির জীর্ণ শরীরে।

> আটের দশকের শেষ, ডুয়ার্সে ফ্ল্যাট কালচার শুরু হয়নি তখনও। দোতলা বাড়ি শহরে তখন হাতে গোনা। বেশির ভাগই টিনের চালের একতলা ইংরেজি 'ইউ' শেপের বাড়ি। মাঝখানে বেশ খানিকটা উঠোন। উঠোন জুড়ে মরশুম ফুল। একদিকে হলদে গাঁদার বন। অন্য দিকে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আর পপি। উঠোনে আদ্যিকালের কালো হয়ে যাওয়া শিরীষ কাঠের চেয়ারে বসে থাকতেন বাড়ির অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ মানুষটি। ঝিমাতেন মাথা এলিয়ে দিয়ে।

উঠোনের এক কোণে বসে কাজ করত ধুনকর। সারা বছর এরা কোথায় থাকত কে জানে, কিন্তু শীত পড়তে না পড়তেই এসে হাজির হত তারা। তুলো ছাড়াবার যন্ত্রটা থেকে আওয়াজ বেরত পিড়িং পিড়িং করে। এটাই ছিল শীতের আগমনি বাদ্য। গাছকোমর করে শাড়ি পরা গৃহবধূ গায়ে চেরা উলের সোয়েটার চাপিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে কড়া চোখে জরিপ করত ধুনকরকে।

শীতের দুপুরে বাড়িতে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমাবার অবকাশ ছিল না। না, পড়ার টেবিলে নয়, শীতের দুপুরবেলাটা আমাদের কাটত ক্রিকেট খেলে। দু'ডজন ছেলে মিলে তুমুল শারীরিক কসরতের পর শ্রান্ত হয়ে কোমর ধরে বসে পড়তাম খেলার মাঠে। প্র্যাকটিস শুরুর সময় নেট টাঙানো আর পিচে টানটান করে ম্যাট পাতা ছিল একটা অপছন্দের কাজ। অনুশীলন সাঙ্গ হলে শ্রান্ত শরীরে সেই নেট তোলা আর ভারী ম্যাট গুটিয়ে ক্লাবঘরে নিয়ে যাওয়া ছিল আরও বেশি আয়াসসাধ্য কাজ। সেসব সবাইকেই করতে হত নিজেদের মধ্যে দল ভাগ করে নিয়ে পালা করে করে। সব শেষে সেদ্ধ ছোলা আর আখের গুড় খাওয়া হত এলোমেলো বসে। সঙ্গে ধূমায়িত লাল চা। ক্রিকেটের গল্প হত, ক্রিকেটের নয় এমন গল্পও। 'টক অব দ্য টাউন' সুন্দরীদের নিয়ে চর্চাও চলত জমিয়ে।

তার মধ্যেই লক্ষ করতাম, কাঠের আশপাশের কয়লা ঘুঁটের উনুন নিংড়ানো ধোঁয়া শীতের সন্ধ্যায় খেলার মাঠের উপর একটা সাদা চাদর বিছিয়ে দিত। ইংরেজিতে যেমন স্মোক আর ফগ মিলিয়ে স্মগ, তেমনি ধোঁয়া মাখানো কুয়াশার একটা সুন্দর নাম দিয়েছিল কাগজগুলো। ধোঁয়াশা। এখন আর কয়লার উনুন জ্বলে না। ডুয়ার্সের সন্ধের সেই ধোঁয়া-ধোঁয়া চাদরটা আর নেই। শহর হয়ত হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু সেই শীত-সন্ধ্যার দৃশ্যটা আর দেখতে পাওয়া যায় না বলে মনটা মেদুর হয়।

রাত জেগে হইহল্লা করার জোশ সকলের থাকে না। আমারও নেই। ছিল না কোনওকালেই। হাসপাতালে প্রিয়জন ভরতি হলে তবেই শুধু রাত জেগেছি। শখ করে বিনিদ্র রজনি যাপন করিনি কখনও। তবে এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কমে গিয়েছে। ঘুমাতে ঘুমাতে একটু রাত হয়ে যায়। উঠেও পড়তে হয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় পড়াশোনার ভয়ে দশটা বাজতে না বাজতেই হাই তুলতে শুরু করতাম। তখন বাৎসরিক পরীক্ষা হত ডিসেম্বর মাসে। সারা বছর ফাঁকি দিতাম বলে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পরীক্ষার ঠিক আগের এক মাস ছিল আমার মতো ছাত্রদের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়। ফলে ভোরবেলা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে হত। জানলা খুলে দিতেই হিম মাখা প্রথম আলোর রেণু স্পর্শ করত ঘুম লেগে থাকা চোখে। পেলব উষ্ণতা জড়ানো সে এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি।

মেগাসিটির মতো ডুয়ার্সের শহরগুলোতেও শুরু হয়েছে ফ্ল্যাট কালচার। বাস্তুভিটে সিঁধিয়ে যেতে শুরু করেছে প্রোমোটারের পেটে। গজিয়ে উঠছে বহুতল। উঠোন নেই। গ্রিলে ঘেরা এক ফালি বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকি আমরা। বাড়িতে পিঠেপুলি বানিয়ে খাওয়ার সময় নেই। মন্ত্রীদের উদ্‌বোধন করে যাওয়া খাদ্য উৎসবে দু'-একদিন গিয়ে পিঠেপুলি খাওয়া হয়। পুষ্পমেলা বা হস্তশিল্প মেলায় গিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি ভাপা পিঠে খেয়ে সন্তুষ্ট করি রসনাকে। ঝাঁ-চকচকে সুইট শপের নিয়ন সাজানো শোকেস থেকে পাটিসাপটা কিনে খাই। কাঁথা সেলাই করার ঠাকুমারা আর নেই। শীতের শুরুতে হাঁক দিয়ে দিয়ে বালাপোশ বানাবার লোক আর আসে না বাড়িতে। আমরা অনলাইন শপিং সাইটে গিয়ে অর্ডার দিই রাজস্থানি রজাই। শীতের জন্য হিমকাতরতা আর নেই আমাদের মধ্যে। চাঁদ মেশানো হিমেল বাতাসের আগমনপথ আমরা বন্ধ করে দিই দশ বাই দশ ফুট ঘরের জানলা বন্ধ করে।

ছবি: সায়নি চন্দ

বই পত্রের ডুয়ার্স

আনন্দগোপাল ঘোষ অনেকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন। অনুসন্ধানের ফল নিয়ে লিখেছেন একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ এবং অগণিত প্রবন্ধ। কয়েক মাস আগে দুর্গা পূজার সন্ধ্যায় রাস্তার পাশে বসা অস্থায়ী এক স্টল থেকে কিনেছিলাম তাঁর লেখা 'মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও তাঁর আন্দোলনের উত্তরাধিকার' গ্রন্থটি। সম্প্রতি সেটা পড়ে ফেলা গেল। পঞ্চানন বর্মা বিষয়ে আনন্দবাবু অনেকদিন ধরেই উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন। কলেজজীবনে তাঁর নতুন পাড়ার বাড়িতে বেশ যাতায়াত হত। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, ওই সময়ে তাঁর মুখেই আমি ঠাকুর পঞ্চানন সম্পর্কে প্রথম সম্যক অবহিত হই— যদিও শহরের সমাজপাড়ার মোড়ে তাঁর 'স্ট্যাচু' তার আগে অন্তত হাজারবার দেখেছি। আনন্দবাবু যে

সময়ে পঞ্চানন বর্মাকে নিয়ে উৎসাহিত হতে শুরু করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন বিরল। কারণ ইদানীং তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু হলেও ওই সময়ে তাঁর বিষয়ে রাজবংশী বুদ্ধিজীবীরাও আশ্চর্যরকম নীরব ছিলেন। 'গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী'রা কেউ কেউ মনে করতেন যে, তিনি হলেন 'প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র'।

আনন্দবাবু বইটি লিখেছেন তাঁর প্রায় সাড়ে তিন দশকের দীর্ঘ অনুভব থেকে। কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরে কেতাদুরস্ত ব্যাখ্যানের বই হলে আমি এটা দশ পাতার বেশি পড়তে পারতাম না। কিন্তু আনন্দবাবু কেতাবি লেখকই নন। কৌতূহল না থাকলে ইতিহাসের চর্চা ছাত্রপাঠ্য কেতাব প্রসবে সমাপ্ত হয়। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর নিজের বিষয়ের প্রতি আনন্দবাবুর কৌতূহল শিশুর মতো। তাই মতভেদের অবকাশ থাকলেও তাঁর রচনা পড়ার জন্য আগ্রহ থাকে। এই বইটা থেকে পঞ্চানন বর্মার 'কর্ম'টি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর বিষয়ে আমার অনেক দিনের কিছু প্রশ্ন ও সমস্যা এই বইটি পড়ার পর বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রাজবংশীরা অনার্য। প্রচলিত ধারণা হল, আর্যরা ভাল এবং অনার্যরা খারাপ। পঞ্চানন বর্মা তাঁর নিজের জাতিকে এতটাই উদ্‌বোধিত করতে পেরেছিলেন যে, রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বিবেচনা করে দলে দলে উপবীত ধারণ করেছিলেন। এটা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। বিহার-উত্তরপ্রদেশে এমন ঘটনা কেউ ঘটাতে পারলে গান্ধিজিকে 'হরিজন' শব্দটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার হত না। পঞ্চানন বর্মার এই উদ্যোগের ফলে রাজবংশীদের নিজস্বতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে কি না— এই বিষয়ে হরেক জল্পনা হতেই পারে, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, কোচবিহার রাজ্যের হয়ে রাজবংশীরা প্রচুর যুদ্ধ করেছিল, এবং উপবীতধারণের মধ্যে দিয়ে তাঁরা অর্জন করেছিলেন চরম আত্মবিশ্বাস। অন্য দিকে, কামতাপুরিরা কেন বাঙালি— সে বিষয়ে যুক্তি দিতে আমাদেরও বেশ সুবিধে হয়।

পঞ্চানন বর্মা ঠিক কী কারণে রাজবংশী সমাজকে 'ক্ষত্রিয়করণ'-এর মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে তৎপর হয়েছিলেন, সেটা একালে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে শুনলে রেগে যাবেন, তবুও বলি যে, কোচবিহার রাজ্য, বৈকুণ্ঠপুর এবং দার্জিলিং এখনও যে পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গে থেকে গিয়েছে— এটাই অনেক। পঞ্চানন বর্মার কাজের মূল্য তাই অপরিসীম। আনন্দবাবু অনেকটা গভীরে ডুব দিয়ে পঞ্চানন বর্মার কাজকর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। পঞ্চানন বর্মা সম্পর্কে তো বটেই, উপরন্তু যাঁরা কোচবিহার রাজ্য সম্পর্কে আগ্রহী, তাঁদেরও বইটি পড়া খুব জরুরি। রাজনীতিবিদদের তো বটেই। কার্যকারণ সূত্রে বইটিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের কথাও এসেছে বিস্তৃতভাবে।

জলপাইগুড়ি বইমেলায় পাওয়া গেল কোচবিহারের রাজাদের নিয়ে লেখা একটা সরস পুস্তিকা, শুভেন্দু মজুমদারের লেখা 'গল্পে কথায় কোচবিহার'। বইটিতে যেমন গল্প আছে, তেমনই আছে নিবন্ধ, ভিন্ন লেখকের দু'টি রচনার পুনর্মুদ্রণ এবং স্মৃতি। রাজাদের লেখাপড়া, কাশীযাত্রা, রোমান্স প্রভৃতি বিষয়ে সাতখানা গল্প পড়ে বেশ মজা পেয়েছি। সুনীতি দেবীর লেখার হাত ছিল চমৎকার। তিনিই ভারতের প্রথম মহারানি, যাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন থেকে। তাঁর সঙ্গে নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিয়ে দিতে গিয়ে ইংরেজরা কেমন ঘটকের কাজ করেছিলেন, সেটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে নানাসাহেবের কী সম্পর্ক? প্রায় ঘনাদাসুলভ এই প্রশ্নের জবাবও পাওয়া গেল এইরকম আরেকটা লেখায়।

রচনাভঙ্গি বেশ সাবলীল। তাই এক টানে পড়ে ফেলা যায় বইটি। শুভেন্দুবাবু কোচবিহারে কর্মসূত্রে এসেছিলেন। পুরনো কোচবিহার নিয়ে মেতে উঠেছিলেন নিজের তাগিদে। সে বিষয়ে তাঁর অন্যান্য পরিশ্রমী কাজ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি তাঁর কোচবিহারচর্চার সুস্বাদু উপজাত। যাঁরা

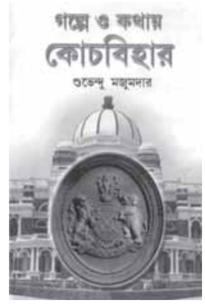

সাধারণ পাঠক, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের বই আরও রচিত হওয়া জরুরি। রাজা-রানি থাকলে গল্প থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু তেমন গল্প কোচবিহার নিয়ে খুব কমই লেখা হয়েছে। চারুচন্দ্র দত্তর রচনাটি তাঁর 'পুরানো কথা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে এই বইতে পুনর্মুদ্রিত করেছেন শুভেন্দুবাবু। শ্রীদত্ত লিখেছিলেন— 'উপরে বলেছি যে কোচবেহার শহরটি খুব আধুনিক ও ভারি সুন্দর। ছেলেবেলায় কিন্তু তার চেয়ে আমাদের অনেক ভাল লাগত সাবেক রাজধানী কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ। বাড়িগুলো ছিল সব পাথরের, শহরের চারিদিকে কেল্লা ও গড়, দেখলে মনে হত— হ্যাঁ, কুচবেহার পুরানো রাজ্য বটে! নতুন মদনমোহন বাড়ির চেয়ে অনেক ভাল লাগত কামতাপুরের নিকটস্থ প্রাচীন দেবীমন্দির। এই মন্দিরের নাম গোসানীমারীর মন্দির।'

হায়! আমরা কত কিছু নষ্ট করে ফেলেছি!

বইটিতে তিনটি নিবন্ধ আছে। এগুলি অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। এই বইয়ের চরিত্রের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহারপ্রীতি বিষয়ক রচনা কোনওমতেই খাপ খায় না। আরেকটি কথা বইটি পড়তে গিয়ে আবার মনে এল। আসল নামটা ঠিক কী হতে পারে? কোচবিহার? কোচবেহার? নাকি, কুচবেহার? এ নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা কোচবিহারবাসীর কর্তব্য। প্রাচীন শহরের মতো প্রাচীন নামটাও নয়ত একদিন হারিয়ে যাবে। আমরা ইতিহাস ধ্বংস করে বোধহীন শিশুর পুলক অনুভব করি সাধারণত।

শুভেন্দুবাবুর বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও তাঁর আন্দোলনের উত্তরাধিকার। আনন্দগোপাল ঘোষ। সংবেদন। মালদা। ২৫০ টাকা। **গল্পে কথায় কোচবিহার**। শুভেন্দু মজুমদার। অণিমা প্রকাশনী। কলকাতা-৯। ৯০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পঁচাত্তর পেরিয়েও যৌবনের গান গায় পাইওনিয়ার ক্লাব

দশকের পর দশক ধরে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার মশালটিকে ঊর্ধ্বে তুলে এগিয়ে চলেছে যে সংস্থাটি, সেটি 'দ্য পাইওনিয়ার ক্লাব'। দিনহাটার সংস্কৃতি, খেলাধুলার যা কিছু, তার সিংহভাগ এই ক্লাবটিকে কেন্দ্র করেই। কোন প্রেক্ষিতে এই ক্লাবের সৃষ্টি, নবীন প্রজন্মের কাছে তা অনেকটাই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। গত শতকের তিনের দশকের শেষ নাগাদ, কোচবিহার সে সময় রাজশাসনের অধীন। দিনহাটা শহরের সুধাংশুশেখর মুস্তাফি নামে এক যুবক, যিনি পাগলা মুস্তাফি নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ও তাঁর বন্ধু ক্ষিতীশ ঘোষ নামে দুই যুবক হঠাৎই নাট্যাভিনয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ে দিনহাটা টাউন ক্লাবে নাট্যচর্চার একটা ধারা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ওই ক্লাবের কর্মকর্তারা এই দুই যুবকের নাট্যাভিনয়ের নেশার মূল্য দেননি। ফলে

তাঁরা নতুন নাট্যদল গঠনে উদ্যোগী হন। অবশেষে দিনহাটার প্রখ্যাত আইনজীবী সুরেন রায়ের সহধর্মিণী রমা রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩৯ সালে গঠিত হল ফরওয়ার্ড ব্লক ক্লাব। কিন্তু বাদ সাধল কোচবিহার রাজপ্রশাসন। ইংরেজদের করদ মিত্র রাজ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। ইতিমধ্যেই ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। ফলে ক্লাবের নামটি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। অবশেষে নামের অর্থটি অপরিবর্তিত রেখে নাম রাখা হল 'দ্য পাইওনিয়ার ক্লাব'। ২১ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের আজ প্রায় সকলেই প্রয়াত। কিন্তু তাঁরা যে সংস্থাটির জন্ম দিয়ে গিয়েছেন, নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে আজও এগিয়ে চলেছে। সূচনা বর্ষ থেকেই পাইওনিয়ার ক্লাবের ১ জানুয়ারির স্পোর্টস প্রতি বছর উৎসবের আকার নেয়। এর খ্যাতি মহকুমা ছাড়িয়ে জেলা অতিক্রম করে গিয়েছে। কোচবিহারের নবনাট্য আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এই পাইওনিয়ার ক্লাবের। এই ক্লাবের প্রযোজনা ও পরিচালনায় একের পর এক অভিনয় হয়েছে— 'সম্রাটের মৃত্যু', 'উল্কা', 'বারো ঘণ্টা', 'ফেরারী ফৌজ', 'মাটির ঘর'সহ বহু নাটক। হরিশ পালের জন্মশতবর্ষে 'ফিরে দেখা' নাটকটি দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সম্প্রতি ক্লাবের অপর একটি প্রযোজনা 'উল্টো গাজন'।

এ ছাড়াও ক্লাব প্রাঙ্গণে চালু হয়েছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণকেন্দ্র, আবৃত্তিচর্চাকেন্দ্র, চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণকেন্দ্র, দাবা প্রশিক্ষণকেন্দ্র, নৃত্যকলাকেন্দ্র, সংগীতশিক্ষণ, টেবিল টেনিস কোচিং— আরও কত কী। কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, 'এক দশকে সংঘ ভেঙে যায়।' কথাটির বাস্তবতা রয়েছে। উপদলীয় কোন্দল, ইগোর দ্বন্দ্ব— এগুলি তিল তিল করে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানকে মুহূর্তেই ভেঙে ফেলে। কিন্তু দিনহাটার এই দ্য পাইওনিয়ার ক্লাবটি বোধহয় এর ব্যতিক্রম। কারণ, এই ক্লাবটি কতিপয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সীমাকে অতিক্রম করে এটি দিনহাটার সমস্ত শ্রেণির মানুষের ক্লাব হয়ে উঠেছে। তাই তো একে একে এই ক্লাব আটাত্তর বর্ষে উপনীত— এটা কিন্তু সামান্য কথা নয়।

হরিপদ রায়

ক্লাবের পুরনো ছবি সৌজন্যে মানিক পাল

সারস্বত উৎসব এবার দশ দিনের

১৯৮৩ সালে নেহাত আড্ডার ছলে যে উৎসবের সূচনা সেই সারস্বত উৎসবের নাম আজ শুধু আর মাথাভাঙার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কোচবিহার ছাড়িয়ে মহানগরীতেও তা শোনা যায়। দেখতে দেখতে এবার সারস্বত উৎসবের ৩৫তম বর্ষ। মাথাভাঙায় চাকুরীরত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কিছু কর্মী এবং স্থানীয় কিছু মানুষের উৎসাহে গড়ে উঠেছিল মুক্তধারা নামে একটি সংস্থা। তারাই একবার সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে শুরু করে এই উৎসব। আর তারপর থেকেই প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর দিনই এই উৎসবের সূচনা হয়। এই নামকরণও সেই থেকেই। উদ্যোক্তাদের কাছে জানা গেল নির্দিষ্ট দিনে উৎসব শুরু হলেও প্রতিবারের মতো সাত দিন নয়, এবার এই সারস্বত উৎসব চলবে টানা ১০ দিন। কারণ এবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। যা অন্যান্যবারের তুলনায় অনেক বেশি, জানালেন আয়োজক কমিটির সেক্রেটারি সঞ্জয় বমর্ন। এখানে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ রচনা, বিতর্ক, ছড়া, অনুগল্প রচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, লোকসংগীত, বসে আঁকো, ক্যুইজ, তবলা, ১১টি বিভাগে নৃত্য, রবীন্দ্র-নজরুল, অতুলপ্রসাদী সংগীত প্রতিযোগিতা রয়েছে। আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠানে রয়েছে সাহিত্যসভা, কবি সম্মেলন, আলোচনাসভা সহ নানা লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান। এছাড়াও আমন্ত্রিত শিল্পীদের নানান অনুষ্ঠান। তবে প্রতিযোগিতামূলক নাটক এই সারস্বত উৎসবের মূল আকর্ষণ বলে জানালেন সঞ্জয়বাবু। বললেন, সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সদস্য পদের চাঁদা, শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহযোগিতা দিয়েই এর বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয়। প্রতিবছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতদের সারস্বত সম্মান ও বিজয়ীদের ট্রফি প্রদান করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে বের হয় স্মারক পত্রিকা মানসাই। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে রজতজয়ন্তী বর্ষে পরপর দুটো মাথাভাঙা সংখ্যা বার করা হয়েছিল বলে জানালেন রাজর্ষি বিশ্বাস। সংস্কৃতির জগতে মাথাভাঙার একটি আলাদা স্থান রয়েছে। এই সারস্বত উৎসবে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির নানান ঝলক দেখা যায়। তাই রাজনীতিকে একটু দূরে রেখে এই উৎসবে নানা মানুষের সান্নিধ্যে আসা যায় বলে জানালেন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। তবে দিন দিন মূল্য বৃদ্ধির কারণে খরচ যেমন বেড়ে যাচ্ছে সেই অনুপাতে বিজ্ঞাপন না আসায় অনুষ্ঠান কী করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় উদ্যোক্তাদের কাছে এটাই এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

সেরা লিটিল ম্যাগাজিন মাথাভাঙার 'তিতির'

ছোট্ট পাখির নামে পত্রিকার নাম হলে কী হবে কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে প্রকাশিত 'তিতির' পত্রিকার অবয়ব কিন্তু মোটেই ছোট নয়। ২০০২ সালে প্রথম প্রকাশ প্রায় পত্রিকাটি। সম্পাদক সঞ্জয় সাহা। তিতির পত্রিকার মূল ফোকাস হল এর 'বিষয়'। সেক্ষেত্রে সঞ্জয় যে যথেষ্ট যত্নবান তা পত্রিকাটির নানান সংখ্যার বিষয়গুলো দেখলেই বোঝা যায়। এবছর তিতির পত্রিকার 'ডায়রী' সংখ্যার জন্য ২০১৭ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি লিটিল ম্যাগাজিন সম্মান পেল পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় সাহা। পুরস্কার প্রদান করলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির সভাপতি শাঁওলি মিত্র। ১১ জানুয়ারি সাহিত্য উৎসব ও লিটিল ম্যাগাজিন মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে কলকাতার মোহরকুঞ্জে পুরস্কার পাওয়ায় স্বভাবতই খুশি সম্পাদক সঞ্জয় সাহা। পেশায় মাথাভাঙা বাইশগুড়ি হাই স্কুলের শিক্ষক তিনি। লেখালেখির অভ্যাস সেই ছোট্ট থেকে। জানালেন, তিতির প্রথম থেকেই বিষয়মুখী। প্রতি বছরই এর বিষয়তে একটা নতুনত্ব থাকে। গত ১৫ বছরে তিনি মৃত্যু বিষয়ক সংখ্যা, দেশ ভাগ, গল্প সংখ্যা, লুপ্তপ্রায় বিষয় সংক্রান্ত সংখ্যা, কবিতা সংখ্যা, কথা সাহিত্য সংখ্যা, রাজবংশী ভাষা সাহিত্য বিষয়ক সংখ্যা সহ নানা বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তিতিরের জন্য ঝুলিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার সহ নানান সম্মান। ২০০৯ সালে দেশভাগ বিষয়ক সংখ্যার জন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে পেয়েছিলেন জাতীয় পর্যায়ের সম্মান, ২০১৫ সালে কলকাতা থেকে কথাসাহিত্যের জন্য 'ইতিকথা' পুরস্কার, ২০১৬ সালে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পত্রিকা সম্পাদনার জন্য চিহ্ন সম্মাননা পুরস্কার। এই পুরস্কারগুলো সম্পাদক হিসেবে তাঁকে ভাল কাজ করতে আরও উৎসাহী করেছে। আর এবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি লিটিল ম্যাগাজিন সম্মান পেয়ে ভীষণ ভাল লাগছে বলে জানালেন সঞ্জয়বাবু। তার তিতির পত্রিকার জন্য 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকেও রইল অনেক শুভেচ্ছা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

বর্ষশেষের রাতে জলপাইগুড়িবাসী পেল এক অন্যরকম সন্ধ্যা

জলপাইগুড়ি শহরবাসী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ রাতে সাক্ষী থাকল এক অন্যরকম সন্ধ্যার। মহকুমাশাসক সীমা হালদারের উদ্যোগে এই অভিনব আসর বসেছিল সমাজপাড়ায় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে। পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের আখড়া বসেছিল মাঠে। ভাওয়াইয়া কবিগান, ব্যান্ড, নৃত্য, মূকাভিনয়— এই সমস্ত কিছুর আলাদা আলাদা ছোট ছোট মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। যার যেটা ভাল লাগছিল, তাতে ভিড় করছিল মানুষ। অল্প সময়ের মধ্যেই জমজমাট মেলার আকার নেয় এই মাঠ। দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা দেখা দেয়। অনুষ্ঠানের মাঝে মানবশৃঙ্খল তৈরি করে, মাঝে বাজি পুড়িয়ে বর্ষশেষ উদ্‌যাপন করা হয়। মাঠে উপস্থিত প্রায় সবাইকেই শিল্পীদের সঙ্গে নৃত্যে পা মেলাতে দেখা যায়, যা অনুষ্ঠানের শোভা আরও বাড়িয়ে দেয়। ছোট থেকে বড় প্রত্যেকেই মেতে ওঠে নাচের তালে তালে। মহকুমাশাসক নিজেও যোগদান করেন বলে উৎসাহিত হয়ে পড়েন দর্শকরা।

সাংস্কৃতিক মঞ্চ ছাড়াও রসনা তৃপ্ত করার জন্য ছিল খাবারের স্টল। মোমো তো ছিলই। আর পিঠেপুলি দিয়ে মিষ্টিমুখে ছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। সব্যসাচী দত্ত, জীবন মণ্ডলদের মূকাভিনয় দেখতে ভিড় উপচে পড়েছিল। পাশে ময়নাগুড়ির প্রধান

রায়ের ভাওয়াইয়া গান অসাধারণ। কবিতাপাঠ থেকে শিববন্দনা, নাট্যানুষ্ঠান থেকে সমসাময়িক নৃত্য— সবকিছুই দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। বাংলা ব্যান্ডটিকেও নিজেদের দিকে দর্শক টানতে দেখা যায় বেশরকম। খাওয়া, আড্ডা, গান-নাচ মিলিয়ে এক সুন্দর মেলবন্ধন তৈরি হয়েছিল বছরের শেষ রাতটিতে। সবার শেষে প্রচুর ফানুস উড়িয়ে আর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এরকম একটি সন্ধ্যা জলপাইগুড়ি শহরবাসীকে উপহার দেওয়ার জন্য মহকুমাশাসক এবং পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। পরের বছর আরও বড় মাপের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আবদার রাখছে সকলে।

হিমি মিত্র রায়

মানুষ গড়ার নাটক ‘ভো-কাট্টা’

জল-স্থল-অন্তরিক্ষব্যাপী আমাদের বেঁচে থাকার আয়তনে বেড়ে উঠতে চায় কৈশোর-যৌবন। কিন্তু অতি আধুনিকতার সংকট এই বেড়ে ওঠায় সৃষ্টি করে বাধা। আকাশ-বাতাস-সবুজ ঘাস ডাকলেও শাসন-অনুশাসনের চাপে-তাপে লাট্টুরা হয় দিক্‌ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত। কিন্তু স্বপ্ন দেখে মন। গণ্ডিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা নয়, শুধু মাথা গুঁজে পড়া নয়, চাই পড়া-পড়া খেলা। আর এর জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। নীল দিগন্তে যেখানে উড়বে ঘুড়ি। দমবন্ধ পরিবেশে শিক্ষার আলো প্রবেশ করে বটে, কিন্তু প্রকৃত ‘মানুষ’ গড়ে তোলা যায় না। তাই মানুষ তৈরির কারিগরদেরও এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। শিক্ষার আয়নায় সমাজকে চেনা যায়— স্কুলছুট এক কিশোরের নতুন করে স্বপ্ন দেখার নাটক ‘ভো-কাট্টা’। শিশু-কিশোর,

যুবক-যুবতীদের এই নাট্যনির্মাণ এক কথায় অনবদ্য। বাংলা নাট্য তার শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে ভরাযৌবনা। আধুনিক নাটক প্রয়োগ এই শিল্পে দিয়েছে নতুন গতি। জলপাইগুড়ির কলাকুশলী কোচবিহার শিশু-কিশোর সংস্থা আয়োজিত শিশু-নাট্য উৎসবে ২০১৬-র ২৪ ডিসেম্বর প্রযোজনা করল নাটক 'ভো-কাট্টা'। আলো-আবহর পাশাপাশি মঞ্চনির্মাণ ও শিল্পীদের অভিনয় নতুন মাত্রা দিয়েছে এই নাটকে। সব দিক দিয়েই তমোজিৎ রায় নির্দেশিত এই নাটক এক অনবদ্য নির্মাণ, যা দর্শক অনেকদিন মনে রাখবেন। বড়দের পাশাপাশি ছোট্টদের পাল্লা দিয়ে অভিনয় শুধু নয়, কখনও কখনও ছাপিয়ে যাওয়াও। লাট্টু ও তার সহযোগী চরিত্রে যথাক্রমে দেবাশিস কুণ্ডু ও সুমিত দাস কিশোরযুগলের অভিনয়ে তাক লেগে যেতে হয়। হিন্দি চলচ্চিত্রের রাজেন খোঁয়া পরিচালিত 'গাট্টু' ছবির প্রেরণায় এ নাটক রচিত হয়েছে। অসাধারণ মঞ্চনির্মাণ ও আলো। আবহ পরিকল্পনা ও গানের সুর দিয়েছেন শৌভিক ধর। গান রচনা করেছেন শুভদীপ সাহা।

জগন্নাথের বাজিমাত

রাজার রাজত্বে যেন সকলের রাজা হবার বায়না। মহারাজার সরলতার সুযোগ নিয়ে রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেপাই, রক্ষী— সকলেই দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত। চেন সিস্টেমে চলা দুর্নীতি রাজার রাজত্বকেই করে তুলল দুর্বল। কারণ, রাজার অন্দরমহলেই যে ঘুণ। এরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে চায়। অত্যাচার করে সরল প্রজাদের উপর। আর রাজাকে দেওয়া হয় ভুল তথ্য। সব মিলিয়ে রাজা হয় দুর্বল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের শিকার হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান করে জগন্নাথ। দুষ্টের দমন করতেই প্রকৃতির আশীর্বাদে জগন্নাথ নামের কাঠপুতুলের জন্ম। এক নিঃসন্তান তাঁতি দম্পতির বাড়িতে আশ্রয় পায় এই জগন্নাথ। মন্ত্রবলে যে দুষ্টু মানুষদের স্ট্যাচু করে দেয়। ছোটদের থিয়েটার স্কুল— শিশু-কিশোর সংস্থা তাদের ২৪ ডিসেম্বর শিশু-নাট্য উৎসব উপলক্ষে কোচবিহার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে পরিবেশন করে নাটক 'জগন্নাথের বাজিমাত'। দিগ্বিজয় দে সরকারের গল্পে নাট্যরূপ দিয়েছেন সোমনাথ ভট্টাচার্য। সম্পূর্ণভাবে শিশু-কিশোরদের দ্বারা অভিনীত এই নাটকের আবহর দায়িত্বে ছিলেন বাপি সূত্রধর ও শুভঙ্কর দে। আলো পঙ্কজ মৈত্রর। মঞ্চ নির্মাণ করেছেন তমোজিৎ রায়। জগন্নাথ চরিত্রে শরদিন্দু ঘোষের অভিনয় অনেকদিন মনে থাকবে। তাঁতি ও তার বউয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শীর্ষেন্দু ঘোষ ও সৃজা পাঠক। বৃদ্ধার চরিত্র অভিনয়গুণে দারুণ ফুটিয়ে তুলেছে অনন্যা দাস। সব মিলিয়ে এক সুন্দর নাট্য উপহার দিয়েছে কোচবিহার শিশু-কিশোর নাট্যসংস্থা। একবারে ২৬ জন শিশু-কিশোরকে মঞ্চে অভিনয় করানোই এক অসাধ্যসাধন।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

অকৃত্রিম নীলমদিদি

একা হাতেই সামলান হোমস্টে থেকে দোকান-বাগান

গত সংখ্যার 'এখন ডুয়ার্স'-এ দলগাঁওয়ের দু'টি হোমস্টে নিয়ে লিখেছিলাম। সেই সঙ্গে ছিল দলগাঁওতে চলতে থাকা 'ন্যাফ'-এর ক্যাম্প নিয়েও নানান অভিজ্ঞতার কাহিনি। এই ব্যাপারে কাজ করার জন্যে দলগাঁওতে থাকতে গিয়ে দেখেছিলাম, এই হোমস্টেগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন বাড়ির শ্রীমতীরা। রয়েছে তাঁদের অতিথিপরায়ণতা, পরিশ্রম, ভদ্র ব্যবহার— সব মিলিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন যাপনের মধ্যে ও অতিথিসৎকারে আত্মম্ভরিতাবিহীন সরল মানসিকতা। এরকম এক শ্রীমতীই আমাদের 'এবারের শ্রীমতী'।

বাড়ির মালকিনই নিজে হাতে খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিলেন। একটু হলেও অসুবিধা হচ্ছিল প্রথমটায়। যদিও টাকা দিয়ে থাকা, তবুও একটু যেন ছোট-বড় বিভেদের ধন্দে বিভ্রান্ত লাগছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আমি প্লেট দুটো নিতে গেলাম। দিলেন না। ব্যাপারটা অর্থবহ। রীতিমতো ভাল অর্থের বিনিময়ে যাঁরা থাকতে এসেছেন, তাঁদের এই সার্ভিসটা দিতেই হবে— এই মানসিকতা নিয়েই চলে হোমস্টের ব্যবসা। ফলে বাড়ির মালিক হলেও এখানে তাঁরা সার্ভিস প্রোভাইডার। অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রফেশনাল মেন্টালিটি। আমার মনে একটা ছবি ভেসে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। সমতলে আমাদের চোখের সামনে বহু বাড়ি আছে, যারা কয়েকটা ঘর কিংবা একটা তলা ভাড়া দিয়ে ভাড়াটিয়ার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেন যে মনে হয়, তিনি থাকতে দিয়ে ধন্য করেছেন অথবা বিনা পয়সায় থাকতে দিয়েছেন। অনেক তফাত এই গ্রাম্য নেপালি পরিবারগুলোর মানসিকতার সঙ্গে। মিষ্টি ব্যবহারে দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে যেন কত আপন করে নিলেন আমাদের। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে এসে গল্প করে, ভালমন্দ খবর নিয়ে, কোনও অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে এমন আদর দিলেন, যাতে এঁদের কথা ভুলতে না পারি কোনও দিন। কিন্তু ব্যবহারের মধ্যে এক বিন্দুও শহুরে কৃত্রিমতা নেই, নেই অকারণ লোক দেখানো উচ্ছ্বাস, বাড়তি কোনও আবেগ। সময়মতো বাথরুমে গরম জল রেডি, বাথরুম প্রতিদিন পরিষ্কার, অর্ডার দিলেই গরম গরম চা কিংবা কফি, প্রয়োজনে বিছানার চাদর পালটে দেওয়া— সব দায়িত্ব একা হাতে সামলে চলেছেন ওই মালকিন। নীলমদিদি। ওটা অবশ্য আমি ডেকেছিলাম। এমনিতে ওঁর নাম নীলম শর্মা। মোটাসোটা, গোলগাল, ফরসা। ট্রাউজারস আর টপ পরে সারাদিন কিছু না কিছু কাজ করেই চলেছেন। নিজেদের খাওয়াদাওয়া, অতিথিদের খাওয়াদাওয়া ছাড়াও নিজের সংসারের সমস্ত কাজ, সঙ্গে অতিথিদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের দেখভাল— সব দায়িত্ব তাঁরই। আমাদের তথাকথিত শহুরে শিক্ষিতদের বড্ড ইগো আর নাক সিটকানোর বাতিক। নীলমদিদি ওসবের ধারই ধারেন না। অথবা জানেনই না, শেখেনইনি কোনও দিন। কিংবা এমনও হতে পারে, প্রয়োজনও পড়েনি নিজের ইগো নিয়ে ভাববার। নিজেদের ঘর ছেড়ে দিদির ঘরে বসে চা খেতে খেতে গল্প করেছি অনেকক্ষণ। তখন জেনেছি, পিছনে কিচেন গার্ডেনটাও উনি নিজে হাতে দেখাশোনা করেন। মাংসের মধ্যে সবুজ সবুজ পাতাকে ধনেপাতা ভেবে ভুল করছি দেখে নীলমদিদি যথেষ্ট চিন্তিত মুখে বারবার বোঝাতে লাগলেন, 'উও ধনিয়াপত্তা নহি হ্যায়, উও সোপ হ্যায়।' সাবান ছাড়া সোপ নামে অন্য কোনও পদার্থ চিনি বলে মনে পড়ল না। ভুলভাল শুনছি ভেবে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'সোপ? উও কেয়া হ্যায়?' 'ধনিয়াপত্তা জ্যায়সা হি দিখতা হ্যায়, লেকিন থোড়া অলগ।' নিজের কিচেন গার্ডেনে নিয়ে গিয়ে দেখালেন গাছগুলো। খাবারে সোপপাতা দিলে খাবার তো সুস্বাদু হয়ই, এনার্জিও নাকি বাড়ে। এখানকার সিঙ্কোনা বাগানে ৪২৮ জন লেবার রয়েছে, যারা বাগানে যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ করে। এইসব শ্রমিক নাকি সোপপাতার রস করে খায় তাদের এনার্জি লেভেল বাড়ানোর জন্য। খুবই উপকারী এই পাতা। এটা পাহাড়িদের এক্কেবারে নিজস্ব।

শুধুই কি সংসার করেন আর হোমস্টে চালান নীলম? না। নিজের একটি দোকান আছে বাড়ি লাগোয়া। সেখানে বহু ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অনেকটাই পাওয়া যায়। এমনকি মেলে অল্পস্বল্প ড্রেস মেটিরিয়ালও। দোকানে যে সবসময় খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে তেমন নয়। ছোট্ট জায়গায় লোকসংখ্যাও কম, তাই ভিড় না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু সারাদিন দোকান খোলা, হাঁক পাড়লেই দোকানি নীলম হাজির। চোর-টোরের ভয় নেই এখানে।

গরিব মানুষরাও খেটে খেতেই পছন্দ করে। ফলে সকালবেলা দোকান খুলে দিয়ে ঘরের ভিতরে নিজের কাজ করতে পারেন নিশ্চিন্ত মনে। এত কাজ করার পরও কি আমরা ভাবতে পারি এঁর অবসরযাপন নিয়ে? অবসর কোথায়? ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটা থেকে দিন শুরু করে রাত আটটায় রাতের খাওয়া সারার পর ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে দায়িত্ব আর কর্তব্যের তারণা। কিন্তু না, তেমনটা একেবারেই দেখলাম না। সাড়ে আটটায় ডিনার সেরে আমাদের ঘরের বারান্দায় বসে স্বামী-স্ত্রী মিলে রাত দশটা পর্যন্ত চলল গল্পগুজব, হাসি-মশকরা। বাড়ির সামনে অন্তত গোটা তিরিশেক নানারকম ঘর সাজানোর গাছ। কে করেন এত গাছের পরিচর্যা? জিজ্ঞেস করে জানলাম, মনের খোরাকের জন্য অবসর বার করে নেন নীলম। কারণ গাছ করাটাই প্যাশন ওঁর। সবুজের প্রতি ভালবাসা আছে বলেই সবুজ ঝাউ দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে বাড়ির নাম

রেখেছেন 'গ্রিন ভিউ হোমস্টে'। একটা গাছ কিনতে চেয়ে বুঝেছিলাম, কতটা ভালবাসা গাছের প্রতি। তিন বছর ধরে যত্ন করে বড় করার পর কিছুতেই তা বিক্রি করতে চাইছিলেন না। স্বামী সিঙ্কোনা বাগানে চাকরি করেন। ফলে বাড়ির সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগটা একটু হলেও নীলমদিদির বেশি। সেটা হওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক। বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চির সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক যোগাযোগ। তাই যে গাছগুলো লালন করেছেন বছরের পর বছর, তাদের প্রতিও তাঁর মমত্ব গড়ে উঠেছে সন্তানের মতোই। তাই মন ভোলানো দাম দিতে চাইলেও রাজি করানো মুশকিল হচ্ছিল। পরে অবশ্য স্বামীর অনুরোধে রাজি হলেন। চলে আসার দিন মনে হয়েছিল, কোনও আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম যেন। আরও ক'টা দিন থেকে গেলে মন্দ হত না। আবার আসব— এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলাম নিজ বাসভূমে।

শ্বেতা সরখেল

পাঠকের দাবিতে আবার শুরু হল জনপ্রিয় কলম 'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনীরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে।

টক-ঝাল লইট্যা মাছ

উপকরণ— লইট্যা মাছ মাথা বাদ দিয়ে তিন টুকরো করে কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে ৫০০ গ্রাম মাছ ছাঁকনিতে ঝরিয়ে রাখতে হবে। বড় পেঁয়াজ বাটা ২টি, বড় রশুন বাটা ২টি, কাঁচালংকা বাটা ৬/৭টি (যে যেমন ঝাল খাবে), বড় টম্যাটো ১টা (পুড়িয়ে নিয়ে বাটা), ধনেপাতা, ১টা পাতিলেবুর রস, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, গোটা জিরে সামান্য, নুন স্বাদ অনুযায়ী, শুকনো লংকা বাটা ১/২ চা চামচ।

প্রণালী— সরষের তেলে ৩/৪টি কাঁচালংকা ও গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ, রশুন, কাঁচালংকা, টম্যাটো, শুকনো লংকা বাটা একে একে দিয়ে খুব ভাল করে কষতে হবে। মশলা থেকে যখন তেল ছাড়তে থাকবে, তখন কয়েকটা চেরা কাঁচালংকা ও জল ঝরিয়ে রাখা মাছগুলি কড়াইতে দিতে হবে, এবং কড়াইটি ৫/৬ সেকেন্ড পরপর টস করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কড়াইতে খুন্তি দিয়ে নাড়া চলবে না। ৩/৪ মিনিট এভাবে টস করবার পর কড়াইতে ধনেপাতা কুচি ও পাতিলেবুর রস দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে কিছুক্ষণ রেখে গরম ঝরঝরে ভাত খেয়ে দেখুন, খাওয়াটাই জমে যাবে।

ডুয়ার্সের ডিশ

আপনার কোনও রেসিপি থাকলে ছবি সহ মেল করুন।

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-10/1 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

কলকাতা বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর বই

স্টল নং ১২৮

পর্যটনের বই

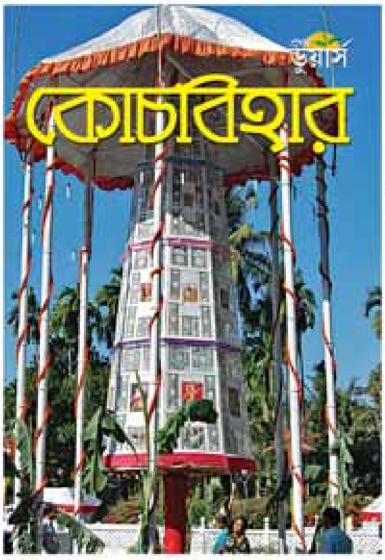

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

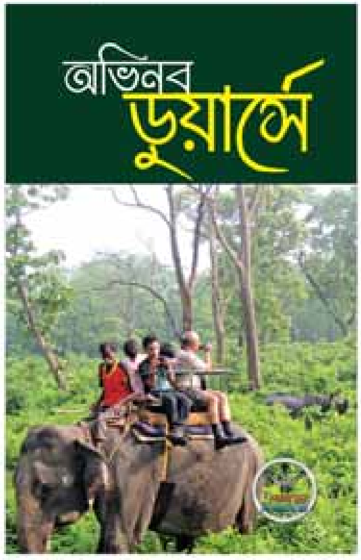

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

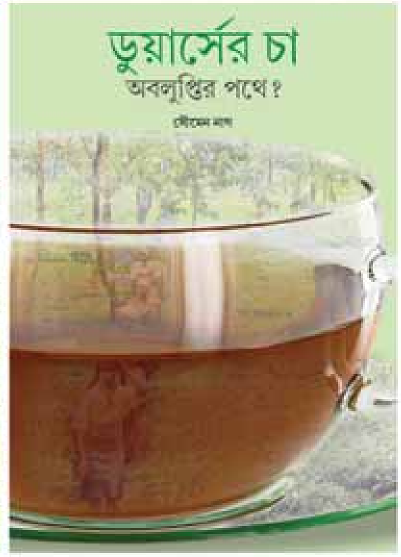

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

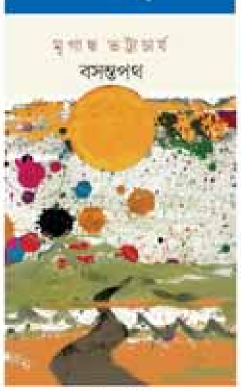

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান | আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

অন্যান্য শহরে বইয়ের প্রাপ্তিস্থান জানতে ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.